এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(তৃতীয় খণ্ড)

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম গাযযালী (রাহঃ)

অনুবাদ

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা মুঃ আবদুল আজিজ

মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শাখা ঃ ৫৫-বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন
তৃতীয় খণ্ড
ইমাম গায্যালী (রাহঃ)
অনুবাদ ঃ
মুহিউদ্দীন খান

প্রকাশক ঃ
মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ ঃ
রমযান ঃ ১৪০৭ হিজরী

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪১০ হিজরী

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
যিলহজ্জ ঃ ১৪২০ হিজরী
বৈশাখ ঃ ১৪০৬ বাংলা
এপ্রিল ঃ ১৪৯৯ ইংরেজী

চতুর্থ সংস্করণ ঃ
রজব ঃ ১৪২৩ হিজরী

পঞ্চম সংস্করণ
ডিসেম্বর- ২০০৩ ইংরেজি
পৌষ- ১৪১০ বাংলা
শাওয়াল- ১৪২৪ হিজরী

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১৭০.০০ টাকা
ISBN-984-8367-411

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদু লিল্লাহ! মহাগ্রন্থ "এহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন"-এর তৃতীয় খণ্ডেরও পুনঃ মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হলো। ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট তিনটি খণ্ডও যাতে শীঘ্রই পাঠকগণের হাতে তুলে দেয়া যায়, সে জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায়, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই একে একে প্রতীক্ষিত সে খণ্ডগুলিও প্রকাশ করা সম্ভব হবে। অবশ্য প্রত্যেক মহৎ কাজের সফল বাস্তবায়ন একমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে।

"এহইয়াউ উলুমুদ্দীন"-এর মত একটা মকবুল গ্রন্থ, যা আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বময় সমভাবে নন্দিত, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জ্ঞান সাধকের নিকটই এ গ্রন্থ সমভাবে সমাদৃত, কোন মানুষের রচিত অন্য কোন বইয়ের ভাগ্যে এরূপ জনপ্রিয়তা লাভ আর সম্ভব হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। ফলে দুনিয়ার প্রায় সব কয়টি উল্লেখযোগ্য ভাষাতেই এই কিতাবের পূর্ণাঙ্গ বা অংশ বিশেষের অনুবাদ দেখতে পাওয়া যায়। তাই যতই দিন যাচ্ছে কিতাবটির আগ্রহী পাঠক সংখ্যার পরিধি ততই বিস্তৃত হচ্ছে।

প্রথম দুটি খণ্ড বের হওয়ার পর অনেকেই আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরবর্তী সংস্করণগুলি আরও সুন্দরভাবে পরিবেশন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকে আবার কটু কথা বলে আমাদের উদ্যমকে অবদমিত করারও চেষ্টা করেছেন। উল্লিখিত সবার জন্যই আমাদের আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ পাক যেন প্রত্যেককেই স্ব স্ব নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল দান করেন। কারণ, সবার দ্বারাই আমরা উপকৃত হয়েছি। ত্রুটিগুলি শনাক্ত করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়ার দিশা লাভ করেছি।

আবারও বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে, আমাদের জ্ঞান যেহেতু সীমিত এবং তৎসঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত সময় ও সাজসরঞ্জাম আমাদের নাই, তাই মুদ্রণে এমনকি অনুবাদে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা মোটেও বিচিত্র নয়। সহৃদয় সুধীগণ মেহেরবানী করে ভুল, ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিয়ে অশেষ নেকীর ভাগী হতে পারেন।

বিনীত
মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়
শা'বান, ১৪০৯ হিজরী।

সূচীপত্র

ষষ্ট অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ	
নির্জনবাসের আদব	৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
নির্জনবাস সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের দলীল	৭
নির্জনবাস সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা	১৬
সপ্তম অধ্যায়	
সফর ও তার আদব	৪৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আদব, নিয়ত ও উপকারিতা	৪৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সফরের রুখসতসমূহের বিবরণ	৫৯
অষ্টম অধ্যায়	
সেমা ও তার আদব	৬৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সঙ্গীতের বৈধতা সম্পর্কে মতভেদ	৬৩
সঙ্গীত বৈধ হওয়ার প্রমাণ	৬৬
সঙ্গীত হারাম হওয়ার কারণ	৭৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সেমার প্রভাব ও আদব	৮২
সেমা ও ওজদ	৮৪
নবম অধ্যায়	
সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ	৯৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আদেশ নিষেধের ফযীলত ও বর্জনের নিন্দা	৯৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আদেশ নিষেধের রোকন ও শর্ত	১০৫
যে বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করা হয় তার শর্ত	১১২
আদেশ নিষেধের আদব	১১৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
ব্যাপক অস্বীকার্য বিষয়	১২১
চতুথ পরিচ্ছেদ	
শাসক শ্রেণীকে আদেশ ও নিষেধ করা	১২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
দশম অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
অন্তরের রহস্যাবলী	১৬১
কলব তথা অন্তরের লশকর	১৬৪
অন্তরের আভ্যন্তরীণ খাদেম	১৬৬
মানব অন্তরের বৈশিষ্ট	১৬৯
অন্তরের গুণাবলী	১৭৩
জ্ঞানার্জনের দিক দিয়ে অন্তরের দৃষ্টান্ত	১৭৭
যৌক্তিক, ধর্মীয়, জাগতিক ও পারলৌকিক জ্ঞানে অন্তরের অবস্থা	১৮৩
এলহামের ক্ষেত্রে সূফী ও আলেমেদের পার্থক্য	১৮৮
সুফী সম্প্রদায়ের শিক্ষা পদ্ধতি সঠিক হওয়ার প্রমাণ	১৯০
কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অন্তরের উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার	১৯৬
শয়তানী পথসমুহের কিঞ্চিৎ বিবরণ	২০৮
যিকিরের সময় কুমন্ত্রণা ছিন্ন হয় কি না?	২২৭
পরিবর্তনের দিক দিয়ে অন্তরের প্রকারভেদ	২৩০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সাধনা চরিত্র সংশোধন ও আন্তরিক রোগের চিকিৎসা	২৩৭
সচ্চরিত্রতার ফযীলত ও অসচ্চরিত্রার নিন্দা	২৩৭
সচ্চরিত্রা ও অসচ্চরিত্রার স্বরূপ	২৪১
সাধনা দ্বারা চরিত্রের পরিবর্তন হওয়া না হওয়া	২৪৬
সচ্চরিত্র কিরূপে অর্জিত হয়	২৪৯
চরিত্র সংশোধনের উপায়	২৫২
অন্তরের রোগ ও স্বাস্থ্যের বিবরণ	২৫৫
নিজের দোষ কিরূপে চেনা যায়	২৫৭
কাম বর্জন ও আন্তরিক রোগের চিকিৎসা	২৫৯
সচ্চরিত্রতার আলামত	২৬৫
শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সচ্চরিত্রতা	২৭২
একাদশ অধ্যায়	
উদর ও লজ্জাস্থানের খাহেশের প্রতিকার	২৭৬
ক্ষুধার উপকারিতা ও তৃপ্তির বিপদাপদ	২৮১
উদরের খাহেশ চূর্ণকারী সাধনা	২৮৭
ক্ষুধা ও তার ফযীলতে মিতাচার	২৯৭
রিয়ার বিপদাপদ	৩০১
লজ্জাস্থানের খাহেশ	৩০৩
মুরীদের বিবাহ করা না করা	২০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
যিনা ও কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা	৩১২
দ্বাদশ অধ্যায়	
জিহ্বার বিপদাপদ	৩২০
জিহ্বার বিপদাশংকা ও চুপ থাকার ফযীলত	৩২১
অনর্থক কথাবার্তা	৩২৪
খুসুমত তথা বিবাদ	৩২৯
কথার প্রাঞ্জলতার জন্যে লৌকিকতা	৩৩০
অশ্লীল কথন ও গালি গালাজ	৩৩১
অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনা	৩৩৩
গান ও কবিতা আবৃত্তি	৩৩৪
হাসি ঠাট্টা	৩৩৬
উপহাস ও কৌতুক	৩৩৮
মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কসম	৩৪১
যে যে স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয	৩৪২
গীবত	২৪৫
গীবত থেকে আত্মরক্ষার উপায়	৩৫০
গীবত জায়েয হওয়ার কারণ	৩৫৪
গীবতের কাফফারা	৩৫৬
চোগলখোরী	৩৫৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
ক্রোধ ও হিংসা	৩৬৫
ক্রোধের স্বরূপ	৩৬৮
সাধনার দ্বারা ক্রোধ দূর হয় কিনা	৩৭২
জোশের সময় ও ক্রোধের প্রতিকার	৩৭৮
ক্রোধ হজম করার ফযীলত	৩৮২
প্রতিশোধের জন্যে যে পরিমাণ কথা বলা দূরস্ত	৩৮৬
বিদ্বেষের অর্থ ও তার ফল	৩৮৯
নম্রতার ফযীলত	৩৯২
হিংসার নিন্দা	৩৯৩
হিংসার স্বরূপ, প্রকার ও বিধান	৩৯৭
হিংসার চিকিৎসা	৪০৪
যে পরিমাণ হিংসা দূর করা ওয়াজিব	৪০৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্জনবাসের আদব

প্রকাশ থাকে যে, নির্জনবাস ও মানুষের সাথে মেলামেশা– এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এতদুভয়ের প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু কিছু অনিষ্ট আছে, যে কারণে মানুষ পছন্দের দৃষ্টিতে দেখে না। আবার অনেক গুণও আছে, যে কারণে মানুষ এগুলোর প্রতি উৎসুক হয়। নির্জনবাস অবলম্বনের প্রতি অনেক আবেদ ও দরবেশের ঝোঁক দেখা যায়। তারা একে মেলামেশার উপর অগ্রাধিকার দান করেন। আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে মেলামেশা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের যে ফযীলত বর্ণনা করেছি, তা বাহ্যতঃ নির্জনবাসের বিপরীত, যার প্রতি অধিকাংশের ঝোঁক রয়েছে। তাই এ সম্পর্কে যা সত্য তা প্রকাশ করা জরুরী। পরবর্তী দু'টি পরিচ্ছেদে এ বিষয়টি বিধৃত হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নির্জনবাস সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের দলীল

এ সম্পর্কে মতভেদ এত গভীর যে, তাবেয়ীগণের মধ্যেও তা প্রকাশ পেয়েছে। সেমতে সুফিয়ান সওরী, ইবরাহীম ইবনে আদহাম, দাউদ তায়ী, ইবনে আয়ায, সোলায়মান খাওয়াস, ইউসুফ ইবনে আসবাত, হুযায়ফা মারআশী এবং বিশরে হাফীর মাযহাব হল, নির্জনবাস অবলম্বন করা উচিত। এটা মেলামেশার চেয়ে উত্তম। পক্ষান্তরে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব, শা'বী, ইবনে আবী লায়লা, হেশাম ইবনে ওরওয়া, ইবনে শাবরামা, শোরায়হ, শরীফ ইবনে আবদুল্লাহ্, ইবনে ওয়ায়না, ইবনে মোবারক, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও অন্যান্য আলেম অধিকাংশ তাবেয়ীর এই অভিমত পছন্দ করেন যে, মেলামেশা করা, অনেক বন্ধু করা, মুমিনদের মধ্যে সম্প্রীতি হওয়া, ধর্মের কাজে তাদের সাহায্য নেয়া মোস্তাহাব। আলেমগণ এ সম্পর্কে কতকগুলো মিশ্র বাক্য প্রয়োগ করেছেন। কোন কোন বাক্য দ্বারা উভয় মাযহাবের মধ্য থেকে কোন এক মাযহাবের প্রতি ঝোঁক এবং কোন কোন উক্তি দ্বারা ঝোঁকের কারণ বুঝা যায়। এখন প্রথম প্রকার উক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রকার উক্তি অনিষ্ট ও উপকারিতার আলোচনায় লিপিবদ্ধ করা হবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা সকলেই নির্জনবাস থেকে আপন আপন অংশ গ্রহণ কর। হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ নির্জনবাস এবাদত। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বন্ধু হওয়ার জন্যে, কোরআন সঙ্গী হওয়ার জন্যে এবং মৃত্যু উপদেশদাতা হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ্কে সাথী করে নাও এবং মানুষকে এক তরফে রাখ। আবুর রবী' দরবেশ দাউদ তায়ীকে বলল ঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ায় রোযা এবং আখেরাত ইফতারের জন্যে রাখ। মানুষের কাছ থেকে এমনভাবে পলায়ন কর, যেমন মানুষ ব্যাঘ্র থেকে পলায়ন করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ তওরাতের কিছু বাক্য আমার স্মরণ আছে– তা হল, মানুষ অল্পে তুষ্ট হলে স্বাবলম্বী হয়। মানুষের কাছ থেকে আলাদা হলে আপদমুক্ত থাকে। কামপ্রবৃত্তি বর্জন করলে স্বাধীন হয়। হিংসা বর্জন করলে ভদ্র হয়। অল্পে সবর করে অনেক মুনাফা অর্জন করে। ওহায়ব ইবনুল ওয়ারদ বলেন ঃ আমি শুনেছি, হেকমতের দশটি অংশ আছে। তন্মধ্যে নয়টি চুপ থাকা এবং একটি নির্জনবাস অবলম্বন করার মধ্যে। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ এখন আপন গৃহে নিশ্চুপ বসে থাকার দিন এসেছে। কথিত আছে, হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) জানাযায় আসতেন, রোগীদের হাল জিজ্ঞেস করতেন এবং বন্ধুবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে সবগুলো বর্জন করলেন। তিনি বলতেন ঃ মানুষ তার সকল ওযরই বর্ণনা করবে– এটা সহজ বিষয় নয়। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-কে কেউ বলল ঃ আপনি আমাদের জন্যে কিছু ফুরসত বের করলে ভাল হত। তিনি বললেন ঃ ফুরসত বিদায় হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই ফুরসত পাওয়া যাবে। ফোযায়ল বলেন ঃ মানুষ যদি পথিমধ্যে দেখা হলে আমাকে সালাম না করে এবং আমি অসুস্থ হলে আমার হাল জিজ্ঞেস না করে, তবে আমি তাদের কাছে ঋণী থাকব। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ রবী ইবনে খায়সাম তাঁর গৃহের দরজায় উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একটি পাথর এসে তাঁর বুকে আঘাত করল এবং রক্তাক্ত করে দিল। তিনি বুকের রক্ত মুছতে মুছতে বলেছিলেন– হে রবী, এখন তো তোমার উপদেশ হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং জানাযা বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কখনও দরজায় বসলেন না। বশীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ মানুষের সাথে পরিচয় কম কর। কেননা তুমি জান না, কেয়ামতে তোমার কি অবস্থা হবে? যদি লাঞ্ছনা হয়, তবে তোমার পরিচিত জন কম হলেই উত্তম। জনৈক শাসক হাতেম আসাম্মের কাছে গিয়ে বলল ঃ আমার কাছে আপনার কোন কাজ থাকলে বলুন ঃ

তিনি বললেন ঃ বড় কাজ হচ্ছে, তুমি আমাকে দেখো না এবং আমি তোমাকে দেখব না। এক ব্যক্তি সহল তস্তরী (রহঃ)-কে বলল ঃ আমি আপনার কাছে থাকার ইচ্ছা রাখি। তিনি বললেন ঃ যখন আমাদের উভয়ের মধ্যে একজন মারা যাবে, তখন কে সাথে থাকবে? তখন যে সাথে থাকে, তার কাছেই তোমার থাকা উচিত। ফোযায়লকে কেউ বলল ঃ আপনার পুত্র আলী বলে– হায়, আমি যদি এমন জায়গায় থাকতাম, যেখান থেকে আমি মানুষকে দেখতাম, কিন্তু মানুষ আমাকে দেখত না। একথা শুনে ফোযায়ল কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ আলীর জন্যে আফসোস, সে কথা বলেছে, কিন্তু অসম্পূর্ণ বলেছে। পূর্ণ কথা তখন হত, যখন বলত, না আমি কাউকে দেখতাম, না কেউ আমাকে দেখত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সেই মজলিস সর্বোত্তম, যা তোমার গৃহের অভ্যন্তরে হয়। সেখানে তুমি কাউকে দেখ না এবং কেউ তোমাকে দেখে না। মোট কথা, নির্জনবাসের প্রতি যাঁরা আকৃষ্ট ছিলেন, এগুলো তাঁদের উক্তি। এখন উভয় পক্ষের প্রমাণাদি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়।

মেলামেশা পছন্দকারীদের প্রমাণ ঃ কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا الاية তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মতভেদ করেছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে সম্প্রীতির কারণ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এসব প্রমাণ দুর্বল। কেননা, প্রথম আয়াতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ কোরআন পাক ও শরীয়তের মূলনীতিতে মতের বিভিন্নতা, মাযহাবসমূহের মতবিরোধ। দ্বিতীয় আয়াতে সম্প্রীতি স্থাপনের মানে হচ্ছে, অন্তর থেকে সেসব হিংসা-দ্বেষ বের করে দেয়া, যা গোলযোগ ও কলহ-বিবাদের কারণ হয়ে থাকে। নির্জনবাস এসব বিষয়ের পরিপন্থী নয়। নির্জনবাসের মধ্যে এগুলো হতে পারে। তাদের দ্বিতীয় দলীল এই হাদীস-

اَلْمُؤْمِنُ اِلْفٌ مَالُوفٌ وَلَاخَيْرَ فِيْمَنْ لَايَاْلِفُ وَلَايُوْلَفُ

ঈমানদার বন্ধুত্ব করে এবং তার সাথে বন্ধুত্ব করা হয়। যে বন্ধুত্ব করে না এবং যার সাথে বন্ধুত্ব করা হয় না, তার মধ্যে কল্যাণ নেই।

এ দলীলটিও দুর্বল। এতে অসচ্চরিত্রতার অনিষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার কারণে বন্ধুত্ব হতে পারে না। যে চরিত্রবান ব্যক্তি মেলামেশা করলে অপরের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং অপরও তার সাথে বন্ধুত্ব করে; কিন্তু নিজের নিরাপত্তা ও সংশোধনের নিমিত্ত মেলামেশা বর্জন করে, এ হাদীসে তাকে বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। তৃতীয় দলীল এই– রসূলে করীম (সঃ) বলেন- مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করে, তার মৃত্যু মূর্খতা যুগের মৃত্যুর মত। অন্য এক হাদীসে আছে-

مَنْ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ فِىْ اِسْلَامٍ وَامِجٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ -

মুসলমানদের ইসলামে সুসংহত থাকা অবস্থায় যে মুসলমানদের বিরোধিতা করে, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের জাল ছিন্ন করে দেয়।

এ দলীলটিও অগ্রাহ্য। কেননা, এখানে দলের অর্থ সেই দল, যে একজন ইমামের বয়াতে একমত। অতএব যে এই দলের বিরোধিতা করবে সে বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে। কাজেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ মতবিরোধ করা। এই হাদীসে নির্জনবাসের কোন উল্লেখ নেই। চতুর্থ দলীল, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তিন দিনের বেশী সাক্ষাৎ বর্জন করতে নিষেধ করেছেন। সেমতে তিনি বলেন ঃ যে তার ভাইকে তিন দিনের বেশী সময় ত্যাগ করে এবং মরে যায়, সে দোযখে যাবে। তিনি আরও বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্যে হালাল নয় যে, সে তার ভাইকে তিন দিনের বেশী ত্যাগ করবে। তাদের মধ্যে যে আগে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে যাবে। আরও বলা হয়েছে– যে তার ভাইকে ছয় দিনের বেশী ত্যাগ করে, সে তার ঘাতকের মত। সুতরাং কেউ নির্জনবাস করলে সে তার বন্ধু ও পরিচিত জনকে ত্যাগ করবে, যা এসব হাদীসদৃষ্টে নিষিদ্ধ। কিন্তু এ দলীলও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এই ত্যাগ করার অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে কথা বলা, সালাম করা ও মামুলী মেলামেশা বর্জন করা। অসন্তুষ্টি ছাড়া মেলামেশা বর্জন করা এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া দুই স্থানে তিন দিনের বেশীও মেলামেশা বর্জন করা জায়েয। এক, যদি জানা যায়, তিন দিনের বেশী ত্যাগ করলে প্রতিপক্ষ সঠিক পথে এসে যাবে এবং দুই, যদি মেলামেশা বর্জন করার মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত আছে বলে মনে করা হয়। হাদীসের নিষেধাজ্ঞা যদিও ব্যাপক, কিন্তু এ দু'টি স্থান এর ব্যতিক্রম। কেননা, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে যিলহজ্জ, মহররম ও সফর মাসের কিছু দিন পর্যন্ত বর্জন

করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপন পত্নীগণকে এক মাস পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। তিনি কসম খেয়ে তাঁদের থেকে পৃথক হয়ে উপরের কক্ষে চলে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর খাদ্য রাখা হত। সেখানে ঊনত্রিশ দিন অবস্থান করার পর যখন তিনি নীচের তলায় নেমে আসেন, তখন আরজ করা হল, আপনি তো ঊনত্রিশ দিন অবস্থান করেছেন। তিনি বললেন ঃ মাস কখনও ঊনত্রিশ দিনেও হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাইকে তিন দিনের বেশী ত্যাগ করবে, কিন্তু তখন, যখন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না থাকে। এ হাদীসে ব্যতিক্রমের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এর উপর ভিত্তি করেই হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ নির্বোধ থেকে আলাদা থাকা উচিত। কেননা, নির্বুদ্ধিতার প্রতিকার সম্ভবপর নয়। মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর সম্মুখে কেউ বলল, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেনি। তিনি বললেন ঃ এ কাজটি পূর্ববর্তীদের মধ্যেও কয়েকজন বুযুর্গ করেছেন। সেমতে সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করে ওফাত পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন। হযরত ওসমান গনী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের সাথে সাক্ষাৎ করতেন না এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বর্জন করে রেখেছিলেন। এসব সাক্ষাৎ বর্জন এই অর্থে ছিল যে, এই বুযুর্গগণ নিজেদের নিরাপত্তা এর মধ্যেই দেখেছিলেন। পঞ্চম দলীল, এক ব্যক্তি এবাদতের জন্যে পাহাড়ে চলে গেলে লোকেরা তাকে ধরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির করল। তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না এবং তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। সম্ভবতঃ এটা বলার কারণ ছিল, ইসলামের প্রথম যুগে জেহাদ অত্যাবশ্যকীয় ছিল। নির্জনবাসের কারণে জেহাদ বাদ পড়ে যেত। সেমতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র যুগে আমরা জেহাদের জন্যে বের হলাম। আমরা একটি উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে নির্মল পানির একটি ছোট ঝরনা ছিল। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি লোকজন থেকে আলাদা হয়ে এখানে একান্তে বাস করলে চমৎকার হত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে আলোচনা না করে এরূপ করব না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ এরূপ করো না। কেননা, আল্লাহ্র পথে তোমাদের অবস্থান করা আপন গৃহে ষাট বছর এবাদত করার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তোমরা জান্নাতে দাখিল হও, এটা কি তোমরা চাও না? আল্লাহ্র পথে জেহাদ কর। দুধের

ধারাসমূহ বের করার মাঝখানে যতটুকু সময় থাকে, ততটুকু সময় যে আল্লাহ্র পথে জেহাদ করবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। ষষ্ঠ দলীল, হযরত মুআয ইবনে জাবালের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاصِيَةَ وَالشَّاذَّ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَامَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْمَسَاجِدِ .

শয়তান মানুষের বাঘ। সে মানুষকে ছাগলের বাঘের ন্যায় গ্রাস করে। গ্রাস করে তাকে, যে দূরে থাকে, যে কিনারায় থাকে এবং যে একা থাকে। তোমরা ছত্রভঙ্গ হওয়া থেকে বেঁচে থাক। সকলের সাথে থাক এবং জমাত ও মসজিদের সাথে থাক। এ হাদীসে নির্জনবাস তার জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যে জ্ঞানার্জনের পূর্বে নির্জনবাস অবলম্বন করে। এর বর্ণনা পরে আসবে।

নির্জনবাসের পক্ষে যুক্তি প্রমাণ ঃ নির্জনবাসের সপক্ষদের প্রথম দলীল এই আয়াত, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন–

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَأَدْعُوا رَبِّي الاية .

আমি পৃথক হচ্ছি তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা এবাদত কর তাদের থেকে। আমি আমার পালনকর্তার এবাদত করি। আর এক আয়াতে আছে–

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا .

অতঃপর যখন সে পৃথক হয়ে গেল তাদের থেকে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তাদের উপাস্যদের থেকে, তখন আমি দিলাম তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব এবং আমি প্রত্যেককে করেছি নবী।

এ থেকে বুঝা যায়, হযরত ইবরাহীম (আঃ) নির্জনবাসের কারণে এই নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ দলীলটিও অগ্রাহ্য। কেননা, কাফেরদের সাথে মেলামেশার একমাত্র উপকারিতা হচ্ছে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া। যখন এ ব্যাপারে নিরাশ হতে হয় এবং জানা যায়, তারা দাওয়াত মানবে না, তখন তাদেরকে ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। আমাদের আলোচনা মুসলমানদের সাথে

মেলামেশা সম্পর্কে। তাদের সাথে মেলামেশায় বরকত হয়। সেমতে বর্ণিত আছে, কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), আপনি মাটির আবৃত পাত্র থেকে ওযু করা অধিক পছন্দ করেন; না সেসব চৌবাচ্চা থেকে, যেগুলো থেকে মানুষ ওযু করে থাকে? তিনি বললেন ঃ পানির চৌবাচ্চা থেকে ওযু করা অধিক পছন্দ করি, যাতে মুসলমানদের হাতের বরকত হাসিল হয়। আরও বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কা'বা গৃহের তওয়াফ করেন, তখন যমযম কূপের কাছে গেলেন তার পানি পান করার উদ্দেশে। এমন সময় দেখলেন, চামড়ার পাত্রে খেজুর ভিজানো আছে। মানুষ সেগুলো হাতে পিষে দিয়েছে এবং তাই হাতে নিয়ে পান করছে। তিনি বললেন ঃ আমাকে এখান থেকে পান করাও। হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ এগুলো হাতে পেষা নবীয। আপনি বললে গৃহে রক্ষিত ও আবৃত মৃৎপাত্র থেকে পরিষ্কার শরবত এনে দেই। তিনি বললেন ঃ আমাকে এখান থেকেই পান করাও, যেখান থেকে সকলে পান করে। আমি মুসলমানদের হাতের বরকত চাই। সার কথা, কাফের ও প্রতিমাদের থেকে পৃথক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের কাছ থেকেও পৃথক হওয়া উচিত। অথচ তাদের সাথে মেলামেশা করলে অনেক বরকত লাভ হয়। দ্বিতীয় দলীল, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন– وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তবে আমা থেকে পৃথক হয়ে যাও। আসহাবে কাহফের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ الاية .

যখন তোমরা তাদের থেকে এবং তাদের উপাস্যদের থেকে পৃথক হয়ে গেছ, তখন আশ্রয় গ্রহণ কর গুহায়। তোমাদের রব তোমাদের জন্যে কিছু রহমত ছড়িয়ে দেবেন।

এতে নির্জনবাসের আদেশ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর যখন কোরায়শরা নির্যাতন চালায়, তখন তিনি তাদের থেকে আলাদা হয়ে পার্বত্য উপত্যকায় চলে যান এবং নিজের বিশেষ সহচরগণকে নির্জনবাস অবলম্বন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করার আদেশ দেন। সেমতে সকলেই হিজরত করেন। পরবর্তীকালে যখন মুসলমানদের বিজয় সূচিত হল, তখন সকলেই মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর সাথে মিলিত হন। এ প্রমাণের মধ্যেও একথাই বিধৃত হয়েছে যে, কাফেরদের কাছ থেকে নিরাশ হয়েই

তারা নির্জনবাস অবলম্বন করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদের কাছ থেকে নির্জনে চলে যাননি। আসহাবে কাহফের সদস্যবর্গও একে অপরের কাছ থেকে নির্জনবাস অবলম্বন করেননি; অথচ তাঁরা সকলেই ঈমানদার ছিলেন; বরং তাঁরা কাফেরদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে ছিলেন। সুতরাং তাদের নির্জনবাস প্রমাণ হতে পারে না। তৃতীয় দলীল, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একবার ওকবা ইবনে আমের জোহানী জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন– আপন গৃহে আবদ্ধ থাক, মুখ বন্ধ রাখ এবং পাপের জন্যে কান্নাকাটি কর। অন্য এক ব্যক্তি আরজ করল, কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন ঃ

هُوَ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى قِيْلَ ثُمَّ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

ঈমানদার, জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদকারী। প্রশ্ন হল, এর পর কে? তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি, যে পাহাড়ের কোন গুহায় আলাদা বসে আল্লাহর এবাদত করে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচায়। এক হাদীসে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ .

আল্লাহ্ তা'আলা পরহেযগার, মালদার, গোপন বান্দাকে পছন্দ করেন।

এসব হাদীসও প্রমাণ হতে পারে না। কেননা, ওকবা ইবনে আমেরকে উপরোক্ত রূপ জওয়াব দেয়ার কারণ ছিল, তিনি নবুওয়তের নূর দ্বারা বুঝে নেন যে, তাঁর জন্যে ঘরে বসে থাকা মেলামেশা করার তুলনায় অধিক উপযুক্ত ও নিরাপদ। এ কারণেই সকল সাহাবীকে তিনি এই আদেশ দেননি। প্রায়ই এমন হয় যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে নির্জনবাসের মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত থাকে– মেলামেশায় নয়। যেমন কারও পক্ষে জেহাদে যাওয়ার চেয়ে গৃহে বসে থাকা ভাল হয়। এর অর্থ এরূপ হয় না যে, জেহাদ বর্জন করা উত্তম। মানুষের সাথে মেলামেশা সাধনা ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে, সে তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের কষ্টে সবর করে না। এমনিভাবে (رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ يَعْبُدُ رَبَّهُ) হাদীসে সেই ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে স্বভাবগতভাবে দুষ্ট। মানুষ তার

সাথে মেলামেশা করে কষ্ট পায়। আল্লাহ্ পরহেযগার, ধনী, গোপন বান্দাকে পছন্দ করেন– এই হাদীসে পরিচয়হীন মেলামেশা করতে এবং খ্যাতি থেকে বেঁচে থাকতে ইশারা করা হয়েছে। নির্জনবাসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, অনেক সংসারত্যাগীকে দুনিয়ার মানুষ চেনে এবং অনেক মেলামেশাকারী অখ্যাতই থেকে যায়। চতুর্থ দলীল, রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কে, আমি কি তা বলব না? তাঁরা আরজ করলেন ঃ অবশ্যই। আপনি এরশাদ করুন। তিনি হাতে পশ্চিম দিকে ইশারা করে বললেন ঃ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে আল্লাহ্র পথে আপন ঘোড়ার লাগাম ধরে নিজে ধাওয়া করার অথবা অপরের তার প্রতি ধাওয়া করার প্রতীক্ষায় থাকে। আমি তোমাদেরকে সে ব্যক্তির কথাও বলছি, যে তার পরে উত্তম। অতঃপর তিনি হেজাযের দিকে হাতে ইশারা করে বললেন ঃ তার পরে সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে ছাগলের পালে নামায আদায় করে, যাকাত দেয়, নিজের মালের মধ্যে আল্লাহ্র হক চেনে এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে একান্তে বাস করে।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার পর এখন আমরা বলছি, সন্তোষজনক প্রমাণ কোন পক্ষেই পাওয়া যায়নি। তাই সত্য ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে নির্জনবাসের উপকারিতা ও প্রয়োজনাদি পুংখানুপুংখরূপে খতিয়ে দেখা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নির্জনবাস সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা

প্রকাশ থাকে যে, নির্জনবাস ও মেলামেশা সম্পর্কে মনীষীগণের মতভেদ বিবাহ এবং চিরকৌমার্যব্রতের মধ্যে মতভেদের অনুরূপ। বিবাহ অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা করেছি যে, সর্বাবস্থায় একটির শ্রেষ্ঠত্ব অপরটির উপর বলা যায় না; বরং অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে কারও জন্যে বিবাহ এবং কারও জন্যে কৌমার্যব্রত উত্তম। সেমতে বিবাহের বিপদাপদ ও উপকারিতাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছি। অনুরূপভাবে আমরা আলোচ্য ক্ষেত্রে নির্জনবাসের উপকারিতা লিপিবদ্ধ করছি। নির্জনবাসের উপকারিতা দ্বিবিধ– একটি পার্থিব, অপরটি পারলৌকিক। দ্বিতীয়টির উদাহরণ যেমন– এবাদত ও চিন্তা ভাবনায় মগ্ন থেকে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য অর্জন করা অথবা মেলামেশার উপর ভিত্তিশীল নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা, যেমন, রিয়া, পরনিন্দা, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ থেকে চুপ থাকা, খারাপ সঙ্গীদের মন্দ চরিত্র ও দুষ্ট ক্রিয়াকর্ম নিজের মধ্যে সংক্রমিত হওয়া ইত্যাদি। পার্থিব উপকারিতার উদাহরণ যেমন– নির্জনতায় কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হওয়া, সেমতে পেশাদার ব্যক্তিরা একাকিত্বে তাদের পেশার কাজও খুব করে নেয়, সেসব অনিষ্ট থেকেও বেঁচে থাকে যা মেলামেশার মধ্যে হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ জগতের চাকচিক্যের দিকে তাকানো, মনে-প্রাণে সে দিকে আকৃষ্ট হওয়া, অপরের বস্তুর জন্যে লালায়িত হওয়া, তার বস্তুতে অপরের লালসা করা ইত্যাদি। নির্জনবাসের কারণে মানুষ এসব জাগতিক আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। মোট কথা, এগুলো হচ্ছে নির্জনবাসের উপকারিতা। এক্ষণে আমরা এগুলোকে ছয়টি উপকারিতায় সীমিত করে বিস্তারিত বর্ণনা করছি।

প্রথম উপকারিতা, এবাদত ও চিন্তা-ভাবনার জন্যে অবসর লাভ করা, মানুষের সাথে বাক্যালাপের পরিবর্তে আল্লাহ্ আআলার সাথে বাক্যালাপ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপারাদিতে এবং মর্ত ও স্বর্গলোকে খোদায়ী রহস্য জানার কাজে আত্মনিয়োগ করার সৌভাগ্য নির্জনবাসের মাধ্যমে নসীব হয়ে থাকে। কেননা, এসব বিষয় অবসর মুহূর্ত চায়। মেলামেশা করলে অবসর মুহূর্ত থাকে না। সুতরাং নির্জনবাসই এসব সৌভাগ্য অর্জনের উপায়। এ

কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) শুরুতে হেরা পাহাড়ে সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে নির্জনবাস করতেন। নবুওয়তের নূর পূর্ণাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকে। এর পর সৃষ্টি তাঁর মধ্যে ও আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে আড়াল হত না। বাহ্যিক দেহ দিয়ে তিনি সৃষ্টির সাথে ছিলেন এবং অন্তর দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার মধ্যে নিবিষ্ট থাকতেন। মানুষ ধারণা করত, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু), কিন্তু তিনি বলে দিলেন, তাঁর সবকিছু আল্লাহ্র মধ্যে নিমজ্জিত। তিনি বলেন ঃ

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله.

আমি যদি কাউকে খলীল করতাম, তবে আবু বকরকেই খলীল করতাম; কিন্তু তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ, আমি) আল্লাহ্র খলীল।

বাহ্যতঃ মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকা এবং অন্তরে মনে-প্রাণে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকা নবুওয়তের শক্তি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তিই যেন নফসের ধোঁকায় এসে এই মর্তবার লালসা না করতে থাকে। তবে কোন কোন ওলীর মর্তবা এতটুকু হয়ে যাওয়া অবান্তর নয়। সেমতে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ আমি ত্রিশ বছর ধরে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলছি, অথচ মানুষ ধারণা করে, তাদের সাথে কথা বলছি। এটা সেই ব্যক্তির জন্যে সহজলভ্য, যে আল্লাহর মহব্বতে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয় এবং তাতে অপরের জন্যে কোন অবকাশ না থাকে। এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ, যারা মানুষের আশেক, তাদের অবস্থাও এমন হয়ে যায় যে, মানুষের সাথে দেখা করে, কিন্তু কাউকে চেনে না এবং কারও আওয়াযও শুনে না। বিবেকবানদের কাছে পরকালের ব্যাপার খুবই গুরুতর। এর চিন্তায় কারও অবস্থা এরূপ হয়ে যেতে পারে। তবে নির্জনবাস দ্বারা সহায়তা নেয়া অধিকাংশের জন্যে উত্তম। এ কারণেই জনৈক দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হল ঃ নির্জনবাসের উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন ঃ নির্জনবাস দ্বারা কাম্য চিন্তা ভাবনার স্থায়িত্ব এবং অন্তরে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা লাভ উদ্দেশ্য, যাতে উৎকৃষ্ট জীবন অর্জিত হয় এবং মারেফতের মিষ্টতা আস্বাদন করা যায়। জনৈক দরবেশকে বলা হল, নির্জনবাসে আপনার ধৈর্য অত্যধিক। তিনি বললেন ঃ আমি একা থাকি না। পরওয়ারদেগার আমার সাথে উপবিষ্ট থাকেন। আমি যখন চাই, তিনি আমাকে কিছু বলুন, তখন তাঁর কিতাব কোরআন পড়তে শুরু করি। আর যদি চাই, আমি তাঁকে কিছু বলি তবে

নামাযে রত হয়ে যাই। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ আমি ইবরাহীম ইবনে আদহামকে সিরিয়ার শহরসমূহে দেখে আরজ করলাম ঃ আপনি খোরাসান একদম ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি আরাম এখানেই পেয়েছি। আমার ধর্মকর্ম নিয়ে এখানে আমি এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে ঘুরাফেরা করছি। আমাকে কেউ দেখলে এ কথা বলে ঃ লোকটি সন্দেহজনক অথবা কোন উষ্ট্রচালক কিংবা মাঝি। হযরত হাসান বসরীকে লোকেরা বলল ঃ এখানে এক ব্যক্তিকে আমরা যখনই দেখি, একা একটি স্তম্ভের আড়ালে বসে থাকতে দেখি। সে আপনার মজলিসে শরীক হয় না। তিনি বললেন ঃ তাকে আবার দেখলে আমাকে জানাবে। সেমতে একদিন তাকে পুনরায় দেখে হযরত হাসানকে জানানো হল। তিনি লোকটির কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, আমার মনে হয় তুমি নির্জনতা পছন্দ কর। কিন্তু মানুষের কাছে বসতে তোমার কিসে বাধা? লোকটি জওয়াব দিল ঃ আছে কোন ব্যাপার, যে কারণে আমি লোকজনের কাছে বসি না। হযরত হাসান বসরী বললেন ঃ তাহলে লোকে যাকে হাসান বলে তার কাছেই বস। সে বলল, আমি যে কাজে আছি, তাতে কারও কাছে বসার ফুরসত আমার নেই। তিনি বললেন ঃ মিয়া সাহেব, সে কাজটি কি? সে বলল ঃ সকাল সন্ধ্যায় আমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে; আর আমি গোনাহ্ করি। তাই আমি উত্তম মনে করেছি যে, নেয়ামতের কারণে আল্লাহ্র শোকর করব এবং নিজের গোনাহের কারণে তাঁর কাছে মাগফেরাতের আবেদন করব। এ দু'টি কাজের কারণে আমি ফুরসত পাই না। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা, আমার মতে তুমি হাসানের চেয়ে অধিক সমঝদার। অতএব যে কাজে আছ, তাতেই মগ্ন থাক। কথিত আছে, হযরত ওয়ায়েস করনী (রহঃ) উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হারম ইবনে হাব্বান তাঁর খেদমতে হাযির হলেন। তিনি শুধালেন ঃ কেন এলে? হারম জওয়াব দিলেন ঃ তোমার কাছ থেকে মহব্বত লাভ কার জন্যে এসেছি। ওয়ায়েস বললেন ঃ আমি এমন কাউকে জানি না, যে তার পরওয়ারদেগারকে চেনার পর অন্যের কাছ থেকে মহব্বত লাভ করে। ফোযায়ল বলেন ঃ আমি রাত আসতে দেখে আনন্দিত হই যে, এখন পরওয়ারদেগারের সাথে একাকী থাকতে পারব। কিন্তু যখন সকাল হতে দেখি, তখন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করি। কারণ, এখন লোকজন এসে আমাকে ঘিরে ফেলবে এবং এমন কোন ব্যক্তি আমার কাছে আসবে, যে আমাকে পরওয়ারদেগার থেকে গাফেল করে দেবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন ঃ ভাগ্যবান তারা, যারা দুনিয়াতেও বিলাস করে এবং আখেরাতেও বিলাস করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কিরূপে হবে? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে তো তারা আল্লাহর সাথে সংগোপনে বাক্যালাপ করতেই থাকে, আখেরাতেও তাঁর পড়শী হয়ে থাকবে। যুন্নুন মিসরী বলেন ঃ একান্তে পরওয়ারদেগারের সাথে বাক্যালাপ করার মধ্যেই ঈমানদারদের খুশী ও আনন্দ। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ মানুষ যখন নিজের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্বের গুণ খুঁজে পায় না, তখন নিজ থেকেই আতংক অনুভব করে। এ কারণেই মানুষের সাথে মেলামেশা করে এই আতংক দূর করতে চাই। কিন্তু যখন নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের গুণ থাকে, তখন সে নির্জনতা তালাশ করে, যাতে নির্জনতা দ্বারা চিন্তা-ভাবনায় সাহায্য নেয় এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রকাশ করে। মোট কথা, নির্জনবাসের বড় উপকারিতা হচ্ছে এবাদত ও চিন্তা-ভাবনার ফুরসত পাওয়া।

দ্বিতীয় উপকারিতা, মেলামেশার কারণে মানুষ প্রায়ই সে সকল গোনাহের সম্মুখীন হয়, নির্জনবাসের কারণে যেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এরূপ গোনাহ্ চারটি– গীবত (পরনিন্দা), রিয়া, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ থেকে চুপ থাকা এবং স্বভাবের মধ্যে গোপনে গোপনে কুচরিত্র ও অপকর্ম দাখিল হওয়া, যা জাগতিক লোভ-লালসা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। গীবতের অবস্থা হচ্ছে, এর কারণসমূহ জানতে পারলে বুঝতে পারবে, মেলামেশার অবস্থায় এ থেকে বেঁচে থাকা এক দুঃসাধ্য কাজ। সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ এই গীবত থেকে বাঁচতে পারে না। কারণ, এটা সাধারণ মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, তারা যেখানে সেখানে বসে অপরের গীবত করতে থাকে এবং এতে অসাধারণ আনন্দ ও সুখ অনুভব করে। তারা এর মাধ্যমেই একাকিত্বের আতংক দূর করে থাকে। সুতরাং যদি তুমি মানুষের সাথে মেলামেশা করে তাদের মতই কথাবার্তা বল, তবে তুমি গোনাহ্গার এবং পরওয়ারদেগারের ক্রোধের যোগ্য হয়ে যাবে। আর যদি নিশ্চুপ থাক তবুও গীবতকারী গণ্য হবে। কেননা, যে গীবত শুনে, সে-ও গীবতকারীর মতই দোষী। আর যদি মানুষকে গীবত করতে নিষেধ কর, তবে তারা তোমার দুশমন হয়ে যাবে এবং তোমারই গীবত করতে শুরু করবে। ফলে "রুরিতে ধুলা দূর, জগত হল ধুলায় ভরপুর"-এর মত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে; বরং এটাও আশ্চর্য নয় যে, তারা গীবতের সীমা পেরিয়ে তোমাকে গালিগালাজ করতে থাকবে। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ধর্মের মূলনীতিসমূহের

অন্যতম ও ওয়াজিব। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করবে, সে অবশ্যই খারাপ বিষয়াদি দেখবে। এমতাবস্থায় যদি সে নিশ্চুপ থাকে, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমান সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে নিষেধ করলে নিজেকে নানা ধরনের ক্ষতির লক্ষ্যস্থলে পরিণত করবে; বরং আশ্চর্য নয় যে, যেসব কাজ করতে নিষেধ করবে, তার চেয়ে জঘন্য অপরাধ দেখতে হবে। নির্জনবাসে এসব বিষয় থেকে মুক্ত থাকা যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার খোতবায় বললেন ঃ লোকসকল, তোমরা এই আয়াত পাঠ কর–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ـ

'মুমিনগণ, তোমরা নিজের চরকায় তেল দাও। তোমরা হেদায়াত পেয়ে গেলে যারা পথভ্রষ্ট হয়, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' কিন্তু একে যথার্থ স্থানে ব্যবহার করো না। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

اِذَا رَاَى النَّاسُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ اَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ ـ

মানুষ যখন মন্দ কাজ দেখে এবং তা পরিবর্তন করে না, তখন আশ্চর্য নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে আযাব দেবেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, এমন কি এ কথাও বলবেন– তুমি যখন মন্দ কাজ দেখেছিলে, তখন নিষেধ করলে না কেন? এর পর যদি আল্লাহ্ বান্দাকে জওয়াব অনুধাবন করান, তবে সে আরজ করবে, ইলাহী, আমি তোমার রহম আশা করতাম এবং মানুষকে ভয় করতাম। এটা তখন, যখন মারপিটের কিংবা অসাধ্য কোন কাজের ভয় করে। এর পরিচয় কঠিন অথচ বিপদ মুক্ত নয়। নির্জনবাসে এ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ পরীক্ষা করে, সে প্রায়শঃ অনুতপ্ত হয়। কেননা, সৎ কাজের আদেশ একটি ঝুঁকে পড়া প্রাচীর সোজা করার মত বিপদসংকুল কাজ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীরটি তার উপরই পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। হাঁ, যদি কিছু লোক তাকে সাহায্য করে এবং প্রাচীরটি ধরে রাখে, তবে অবশ্য কোনরূপ ক্ষতি ছাড়াই প্রাচীর সোজা হতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগে সৎ কাজের আদেশে সাহায্যকারী কোথায়? এজন্যেই নির্জনবাস অবলম্বন করা উত্তম।

রিয়া এমন একটি দুরারোগ্য ব্যাধি, যা থেকে বেঁচে থাকা আবদাল ও আওতাদের জন্যেও সুকঠিন– অন্যদের তো কথাই নেই। কেননা, মানুষের সাথে মেলামেশা করলে তাদের আতিথ্য করতে হবে এবং তাদের প্রতি ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করতে হবে। যে এগুলো করবে– সে রিয়া করবে। যে মানুষকে দেখানোর জন্যে কাজ করবে, সে সেসব গোনাহে পতিত হবে– যাতে মানুষ পতিত আছে। ফলে তারা যেমন বরবাদ হয়েছে, সে-ও বরবাদ হবে। এতে কমপক্ষে ক্ষতি হচ্ছে, নেফাক তথা কপটতা অপরিহার্য হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ পরস্পরে শত্রু– এমন দু'ব্যক্তির সাথে তুমি মেলামেশা করলে যদি প্রত্যেকের সাথে তার মর্জি মাফিক ব্যবহার না কর, তবে উভয়ের কাছে দুশমন বলে চিহ্নিত হবে। পক্ষান্তরে যদি উভয়ের সাথে তার মর্জি অনুযায়ী কথা বল, তবে তুমি হবে জঘন্যতম সৃষ্টি। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

تَجِدُوْنَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ـ

'তোমরা দু'মুখো ব্যক্তিকে সর্বনিকৃষ্ট মানুষ পাবে, যে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে যায় এবং অন্য মুখ নিয়ে ওদের কাছে যায়।'

মানুষের সাথে মেলামেশার মধ্যে সাক্ষাতের সময় আগ্রহ ও আনন্দ তো অবশ্যই প্রকাশ করতে হয়। অথচ এটা মূলেই মিথ্যা অথবা অতিরিক্ত পরিমাণটি মিথ্যা হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকারীকে তার কুশল জিজ্ঞাসা, তার প্রতি মায়া-মমতা প্রকাশ করাও জরুরী হয়ে থাকে। সুতরাং তুমি যদি কাউকে জিজ্ঞেস কর, আপনি কেমন আছেন? বাড়ীর সকলেই ভাল তো? অথচ তাদের প্রতি কোন মনোযোগই না থাকে, তবে এটা নির্ভেজাল মোনাফেকী। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ বাড়ী থেকে বের হয়; পথিমধ্যে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজন ব্যক্ত করে বলে, আমার অমুক কাজটি করে দিন। এতে বাহ্যতঃ সে খুব কৃতার্থ হয় যে, তুমি তাকে একটি কাজ করে দিতে বলেছ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে কাজটি করে দেয় না। এরূপ ব্যক্তি বাড়ী ফেরার সময় আল্লাহ্ তা'আলাকেও রাগান্বিত করে এবং নিজের দ্বীনকেও বরবাদ করে। সিররী সকতী বলেন ঃ যদি আমার কাছে কোন বন্ধু আসে এবং আমি তাকে দেখানোর জন্য নিজের দাড়ি হাতে পরিপাটি করি, তবে আমি আশংকা করি, আমার নাম কোথাও মোনাফেকদের তালিকায় লেখা হয়ে না যায়। ফোযায়ল একাকী মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়

এক বন্ধু তাঁর কাছ গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেন এলে? বন্ধু বলল ঃ মনোরঞ্জনের জন্যে। তিনি বললেন ঃ এটা তো আতংকের কাজ। কেননা, তুমি আমাকে দেখানোর জন্যে সাজসজ্জা করতে চাও এবং আমি তোমাকে দেখানোর জন্যে সেজেগুজে বসে থাকি। তুমি আমার খাতিরে মিথ্যা বল এবং আমি তোমার খাতিরে মিথ্যা বলি। সুতরাং এর চেয়ে ভাল হয়, তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও, না হয় আমি তোমার কাছ থেকে উঠে পড়ি। জনৈক আলেম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে মহব্বত করেন, তার কাছে আপন মহব্বত গোপনও রাখতে চান। তাউস খলীফা হেশামের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন ঃ কেমন আছেন? হেশাম ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ তুমি আমাকে "আমীরুল মুমীনীন" বললে না কেন? তাউস বললেন ঃ সকল মুসলমান আপনার খেলাফতে একমত নয়। তাই আমার আশংকা হল, আমীরুল মুমীনীন বললে কোথাও আমি মিথ্যাবাদী হয়ে না যাই। যে ব্যক্তি এভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে, সে মানুষের সাথে মেলামেশা করলে দোষ নেই। নতুবা নিজের নাম মোনাফেকদের তালিকায় লেখাতে সম্মত হলে মেলামেশা করুক।

পূর্ববর্তী মনীষীগণ যখন পরস্পরে মিলিত হতেন, তখন কুশল জিজ্ঞেস করা ও জওয়াব দেয়া থেকে বেঁচে থাকতেন। কেননা, তাঁরা ধর্মের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন– দুনিয়ার অবস্থা নয়। সেমতে হাতেম আসাম্ম হামেদ লাফফাফকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার অবস্থা কেমন? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ নিরাপদ ও সুস্থ আছি। হাতেমের কাছে এই জওয়াব ভাল মনে হল না। তিনি বললেন ঃ হামেদ, নিরাপত্তা তো পুলসেরাত পার হওয়ার পর পাওয়া যাবে এবং সুস্থতা জান্নাতে আছে। হযরত ঈসা (আঃ)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করত, আজ আপনি কেমন? তিনি বলতেন ঃ এমন আছি, যে বস্তু আশা করি তা এগিয়ে আনতে পারি না এবং যে বস্তু ভয় করি তা পিছিয়ে নিতে পারি না। আমলের বদলে বন্ধক আছি। কল্যাণ সম্পূর্ণ অন্যের হাতে। সুতরাং কোন অভাবী আমার চেয়ে অধিক অভাবী নয়। রবী ইবনে খায়সামকে কেউ এ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ দুর্বল গোনাহ্গার আছি। কিসমতের দানাপানি পূর্ণ করছি এবং মৃত্যুর অপেক্ষা করছি। হযরত আবু দারদাকে কেউ এ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ দোযখ থেকে মুক্তি পেলে ভালই আছি। সুফিয়ান সওরীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ তাঁর শোকর তাঁর সামনে করি। এক মন্দ কাজ অন্য মন্দ কাজের সামনে এবং একটি থেকে পলায়ন করে অন্যটির কাছে যাই। হযরত ওয়ায়েস করনীকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি

বললেন ঃ তার অবস্থা কি জিজ্ঞেস কর, যে সন্ধ্যা হলে সকাল পাবে কিনা জানে না এবং সকাল হলে সন্ধ্যা পাবে কিনা বলতে পারে না। মালেক ইবনে দীনারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ বয়স হ্রাস পাচ্ছে এবং গোনাহ্ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনৈক দার্শনিককে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ পরওয়ারদেগারের রিযিক খাচ্ছি আর তাঁর দুশমন ইবলীসের আনুগত্য করছি। কেউ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে জিজ্ঞেস করল ঃ কেমন আছেন? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ আখেরাতের দিকে এক মনযিল অগ্রসর হচ্ছে, তার অবস্থা কি হবে নিজেই বুঝে নাও। হামেদ লাফফাফকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ একটি দিন ও একটি রাত সহীহ্ সালামতে অতিবাহিত হওয়ার কামনা করছি। প্রশ্নকারী বলল ঃ আপনার কোন দিনই কি সহীহ-সালামতে অতিবাহিত হয় না? তিনি বললেন, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাফরমানী করি না, সেদিনটি সহীহ্ সালামতে যায়। এক ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। তাকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার অবস্থা কি? সে বলল ঃ সে ব্যক্তির অবস্থা কি হবে, যে দূরদূরান্তের সফর পাথেয় ছাড়াই অতিক্রম করতে চায়, সান্ত্বনাদাতা সাথী ছাড়া কবরে যায় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের সামনে প্রমাণ ব্যতীত উপস্থিত হয়। হাসসান ইবনে আবী সেনানকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আপনি কেমন? তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি কেমন হবে, যে মরে যাবে, এরপর পুনরুত্থিত হবে এবং হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে। হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ) জনৈক নিঃস্ব ছাপোষা ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার অবস্থা কি? সে বলল ঃ তার অবস্থা কি হবে, যার ঘাড়ে পাঁচশ দেরহাম ঋণ আছে এবং ঘরে অনেক পোষ্য রয়েছে? ইবনে সীরীন আপন গৃহে গেলেন এবং এক হাজার দেরহাম এনে লোকটিকে দিয়ে বললেন ঃ পাঁচশ' দেরহাম দিয়ে ঋণ শোধ করবে এবং পাঁচশ দেহাম বাল-বাচ্চাদের জন্যে রেখে দেবে। হযরত ইবনে সীরীনের কাছে তখন এই এক হাজার দেরহাম ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন ঃ আর কোন দিন কারও অবস্থা জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ, তিনি আশংকা করলেন, অবস্থা জিজ্ঞেস করার পর সাহায্য করতে না পারলে জিজ্ঞাসা রিয়া ও মোনাফেকী বলে গণ্য হবে।

সারকথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ধর্মের অবস্থা এবং আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে অন্তরের হাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। দুনিয়ার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে এবং অন্যের কিছু অভাব-অনটন জানা গেলে তা দূর করার জন্যে সাধ্যমতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি তাদেরকে জানি, যারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতেন না; কিন্তু একজন

অপরজনের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি উজাড় করে দিলে দ্বিতীয়জন তাতে বাধ সাধতেন না। এখন আমি এমন লোক দেখি, যারা একে অপরের আতিথ্য ও সমাদর এতদূর করে যে, গৃহের মুরগীর অবস্থা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে ছাড়ে না। কিন্তু একজন যদি অকপট হয়ে অপরজনের এক পয়সাও নিতে চায়, তবে সে কখনও তা দেয় না। এটা রিয়া ও মোনাফেকী ছাড়া আর কি? এর আলামত হল, যখন দু'ব্যক্তি পরস্পরে সাক্ষাৎ করে তখন একজন বলে 'মেযাজ শরীফ'– অপরজন বলে, আপনার মেযাজ লতীফ? প্রথমজন জওয়াবের অপেক্ষা করে না এবং দ্বিতীয়জন তার প্রশ্নের জওয়াব দেয় না; বরং নিজের প্রশ্ন পেশ করে। এর কারণ এটাই যে, তারা উভয়ই জানে, এটা নিছক একটা লোকদেখানো লৌকিকতার ব্যাপার। মাঝে মাঝে অন্তরে থাকে হিংসা-বিদ্বেষ, কিন্তু মুখে জিজ্ঞেস করা হয় কুশল।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তীরা 'আসসালামু আলাইকুম' বলতেন এবং তখন বলতেন, যখন অন্তর সুস্থ থাকত। এখন বলা হয়, আপনি কেমন, খোদা তা'আলা আপনাকে সুস্থ রাখুন, আপনার মেযাজ মোবারক কেমন? আল্লাহ্ আপনাকে ভাল রাখুন ইত্যাদি। চিন্তা করলে দেখা যাবে, এগুলো সব বেদআতের পথে আমদানী করা হয়েছে– সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে নয়। এতে কেউ অসন্তুষ্ট হয় হোক। এরূপ বলার কারণ, তুমি যদি সাক্ষাত হওয়া মাত্রই অপরকে বল মেযাজ শরীফ, তবে এটা বেদআত। এক ব্যক্তি আবু বকর ইবনে আইয়াশকে প্রশ্ন করল ঃ মেযাজ শরীফ? তিনি তাকে জওয়াব দিলেন না এবং বললেন ঃ আমাকে এই বেদআত থেকে মাফ রাখ। মোট কথা, মেলামেশা প্রায়ই লৌকিকতা, রিয়া ও মোনাফেকী থেকে মুক্ত হয় না। এগুলোর মধ্যে কোনটি নিষিদ্ধ ও হারাম এবং কোনটি মকরূহ, নির্জনবাসের কারণে এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কেননা, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে ও অভ্যাসে তাদের সাথে শরীক হয় না, মানুষ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে এবং তাকে অসহনীয় মনে করবে। তারা তার গীবত করবে এবং তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হবে। ফলে তাদের ধর্মকর্ম এ ব্যক্তির কারণে বরবাদ হবে। অন্যের ক্রিয়াকর্ম ও চরিত্র দেখে তার মধ্যে সেই ক্রিয়াকর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া একটি গোপন ব্যাধি, যা বুদ্ধিমানরাও টের পায় না– গাফেলদের তো কথাই নেই। উদাহরণতঃ যদি কেউ কোন ফাসেক পাপাচারী ব্যক্তির কাছে অনেক দিন বসে, তবে তার মনের অবস্থা পূর্বের তুলনায় বদলে যাবে। অর্থাৎ, তার কাছে বসার পূর্বে তার মনে যতটুকু ঘৃণা ছিল এখন ততটুকু থাকবে না। কেননা, মন্দ

কাজ দেখতে দেখতে মনের কাছে তা সহজ হয়ে যায় এবং তা যে মন্দ, তা মন থেকে মুছে যেতে থাকে। মানুষ মন্দ কাজকে গুরুতর মনে করে বলেই তা থেকে বিরত থাকে। বার বার দেখার কারণে যখন তা গুরুতর থাকে না, তখন বাধাদানকারী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষ স্বয়ং সেই মন্দ কাজ করতে সম্মত হয়ে যায়। যখন মানুষ অনেক দিন পর্যন্ত অন্যকে কবীরা গোনাহ করতে দেখে, সে সগীরা গোনাহ তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। এ কারণেই যে ব্যক্তি ধনীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে তার উপর আল্লাহর নেয়ামতকে কম মনে করে। ধনীর সংসর্গ অবলম্বন করার কারণই হচ্ছে নিজের কাছে যা আছে তা কম মনে করা। পক্ষান্তরে ফকীরের সংসর্গ অবলম্বন করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা যে সকল নেয়ামত দান করেছেন, সেগুলোকে বড় মনে করা। অনুগত ও অবাধ্যদের দিকে তাকানোর প্রভাবও তেমনি। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কেবল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের দিকেই তাকায় যে, তারা এবাদত কিভাবে করেছেন, কিরূপে দুনিয়া থেকে আলাদা রয়েছেন, সে নিজেকে সব সময় সামান্য এবং নিজের এবাদতকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। ফলে সে পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা অবশ্যই করবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াদারদের অবস্থা দেখবে, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি তাদের বিমুখতা, দুনিয়াতে ডুবে থাকা এবং গোনাহে অভ্যস্ত হওয়া, সে নিজের মধ্যে সৎ কাজের সামান্য আগ্রহ পেলেও তার কারণে নিজেকে বড় মনে করবে। এটাই ধ্বংসের পথ। মন বদলে যাওয়ার জন্য কেবল ভাল-মন্দ বিষয় শ্রবণ করা যথেষ্ট– দেখার কোন প্রয়োজনই হয় না।

নির্জনবাসের তৃতীয় উপকারিতা হচ্ছে, এর বদৌলতে গোলযোগ ও কলহ-বিবাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এগুলোতে জড়িত না হওয়ার ফলে ধর্ম ও প্রাণ উভয়ই নিরাপদ থাকে। গোলযোগ ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে খুব কম শহরই মুক্ত। তাই যে কেউ জনপদ থেকে আলাদা থাকবে, সে গোলযোগ ইত্যাদি থেকেও নিরাপদ থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) ফেতনা ও গোলযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন– এক সময় আসবে, যখন মানুষের অঙ্গীকার বিনষ্ট হয়ে যাবে, বিশ্বস্ততা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এমন হয়ে যাবে, অতঃপর তিনি হাতের অঙ্গুলিসমূহ একটি অপরটির ভিতরে রেখে দিলেন। আমি আরজ করলাম ঃ এমন দুঃসময়ে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন ঃ আপন গৃহে বসে থাক, মুখ বন্ধ রাখ, যা জান তা কর, যা জান না তা বর্জন কর এবং বিশিষ্ট লোকদের পথ অনুসরণ কর– জনসাধারণের পথ বর্জন কর। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর

রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

يُوشِكُ أنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتَّبِعُ بِهَا شَعَبَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ -

সেদিন নিকটবর্তী, যখন মুসলমানের উত্তম মাল হবে ছাগল-ভেড়ার পাল। সে এগুলোকে পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টিপাতের জায়গায় নিয়ে ফিরবে এবং নিজের ধর্ম নিয়ে গোলযোগ থেকে পলায়ন করবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ সত্বরই এমন দিন আসবে, যখন ধার্মিকের ধর্ম নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু যে তার ধর্মকে নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে এবং এক গর্ত থেকে অন্য গর্তে শৃগালের ন্যায় পালিয়ে ফিরবে, তার ধর্ম বেঁচে যাবে। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এরূপ কখন হবে? তিনি বললেন ঃ যখন আল্লাহ্র নাফরমানী ছাড়া জীবিকা অর্জিত হবে না। এ সময় এলে কৌমার্যব্রত পালন করা ওয়াজিব হবে। প্রশ্ন হল, আপনি আমাদেরকে বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন। কৌমার্যব্রত কিরূপে ওয়াজিব হবে? তিনি বললেন ঃ সে সময় এলে মানুষের ধ্বংস তার পিতামাতার হাতে হবে; পিতামাতা না থাকলে স্ত্রী-সন্তানের হাতে এবং তারাও না থাকলে আত্মীয়-স্বজনের হাতে হবে। লোকেরা আরজ করল ঃ এটা কিরূপে? তিনি বললেন ঃ তারা তাকে দারিদ্র্যের জন্যে ভর্ৎসনা করবে। ফলে সে সাধ্যাতীত কাজ করবে, যা পরিণামে তার ধ্বংসের কারণ হবে। এ হাদীসটি যদিও কৌমার্যব্রত সম্পর্কে, কিন্তু নির্জনবাসও এ থেকে মুক্ত থাকে না এবং জীবিকা উপার্জন গোনাহ ছাড়া করতে পারে না। আমি একথা বলি না যে, হাদীসে যে যমানার কথা বলা হয়েছে, তার সময় এটাই; বরং এটা সময়ের আগেই হয়ে গেছে। এ জন্যেই হযরত সুফিয়ান সওরীর এই উক্তি প্রসিদ্ধ যে, আল্লাহ্র কসম, নির্জনবাস ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফেতনা ও "হরজের" দিনগুলোর কথা বললে আমি আরজ করলাম ঃ হরজ কি? তিনি বললেন ঃ যখন মানুষ তার সঙ্গীর তরফ থেকে নিরাপদ থাকবে না। আমি আরজ করলাম ঃ যদি আমি সে সময় পাই তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন ঃ নিজের প্রাণ ও হাত বিরত রাখ এবং গৃহের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও। আমি বললাম ঃ যদি কোন ব্যক্তি গৃহের মধ্যে আমার কাছে চলে আসে? তিনি বললেন ঃ আপন কক্ষে ঢুকে পড়। আমি বললাম ঃ যদি

কেউ কক্ষের মধ্যেও এসে পড়ে? তিনি বললেন ঃ মসজিদে দাখিল হয়ে যাও এবং এমনিভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। আমীর মোয়াবিয়ার খেলাফতকালে হযরত সা'দ (রাঃ)-কে যখন লোকেরা যুদ্ধে বের হতে বলল, তখন তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি যুদ্ধে যাব না। হাঁ, এক শর্তে যেতে পারি তোমরা যদি আমাকে এমন তরবারি দাও, যে চোখে দেখে এবং মুখে বলে। সে কাফের দেখলে আমাকে বলে দেবে এবং আমি তাকে হত্যা করব। আর ঈমানদার দেখলে বলবে– সে ঈমানদার। আমি তাকে হত্যা করব না। তিনি আরও বললেন ঃ আমাদের ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কিছু লোক উন্মুক্ত পথে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ ধূলিঝড় শুরু হয়ে গেল। ফলে পথ চেনার জো রইল না। কেউ বলল ঃ পথ ডান দিকে। কেউ কেউ সেদিকেই চলা শুরু করল এবং হতাশ হয়ে ঘুরাফেরা করল। আবার কেউ বলল ঃ পথ বাম দিকে। কেউ কেউ সে দিকে গিয়ে বিফল মনোরথ হল। কিছু লোক সেখানেই অবস্থান করল এবং ঝড় থেমে যাওয়া পর্যন্ত সবর করল। ঝড় থেমে যাওয়ার পর সঠিক পথ তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। মোট কথা, হযরত সা'দ ও অন্য কতক সাহাবী গোলযোগে শরীক হলেন না এবং ফেতনা দমিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সাথে মেলামেশা করলেন না।

বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সংবাদ পেলেন, হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ইরাকের পথে রওয়ানা হয়েছেন। তিনিও রওয়ানা হলেন এবং তিন মনযিল দূরে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হযরত ইমাম বললেন ঃ ইরাক। অতঃপর তিনি ইরাক থেকে আগত চিঠিপত্র ও প্রতিজ্ঞাপত্র তাঁকে দেখালেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আপনি এসব চিঠি ও প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর ভরসা করে ইরাক যাবেন না। কিন্তু হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) মানলেন না। হযরত ইবনে ওমর বললেন ঃ আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য থেকে একটি পছন্দ করতে বললেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আখেরাত পছন্দ করলেন। আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা। আল্লাহর কসম, আপনাদের মধ্য থেকে কেউ দুনিয়ার শাসক হবে না। আপনার জন্যে যা মঙ্গলজনক, তাই আপনাকে দুনিয়া থেকে আলাদা করে রেখেছে। কিন্তু হযরত হোসাইন (রাঃ) ফিরে যেতে অস্বীকার করলেন। ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন ঃ হে শহীদ, আপনাকে

আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। তখন দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন; কিন্তু ফেতনার দিনগুলোতে চল্লিশ জনের বেশী সাহাবী এতে শরীক হওয়ার সাহস করেননি। তাউস (রহঃ) আপন গৃহে বসে রইলেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ দিনকাল খারাপ হয়ে গেছে এবং শাসকরা জুলুম করতে শুরু করেছে। এসব দেখে বসে আছি। হযরত ওরওয়া (রাঃ) আকীকে অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানে বসে রইলেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মসজিদ ত্যাগ করে অট্টালিকায় বসে আছেন? তিনি বললেন ঃ আমি দেখলাম, তোমাদের মসজিদসমূহে ক্রীড়া-কৌতুক হয়, বাজারে এবং গলিতে অশ্লীল অনর্থক কাজ-কারবার চলে। তাই এ পথ অবলম্বন করেছি। এতে এসব বিষয় থেকে মুক্তি আছে। এসব বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, নির্জনবাসের এক উপকারিতা হচ্ছে কলহবিবাদ ও গোলযোগ থেকে নিরাপদ থাকা।

নির্জনবাসের চতুর্থ উপকারিতা হচ্ছে, এতে মানুষের জ্বালাতন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ, মানুষ কখনও তোমাকে গীবত করে জ্বালাতন করে, কখনও কুধারণাবশতঃ অপবাদ আরোপ করে এবং কখনও এমন প্রার্থনা করে, যা পূর্ণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ মেলামেশা করলে তোমার ক্রিয়াকর্ম ও কথাবার্তা তাদের দৃষ্টির সামনে থাকে। যে কাজ ও কথার স্বরূপ তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না, তা স্মরণে রাখে এবং অনিষ্টের সুযোগ পেলেই তা প্রকাশ করে দেয়। সুতরাং তুমি যদি নির্জনে থাক, তবে এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন হবে না। যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। এতে সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করবে এবং তাদের ক্রিয়াকর্মে শরীক হবে, তার দুশমন অবশ্যই থাকবে। সে গোপনে ষড়যন্ত্র করবে। কেননা, যে অত্যধিক দুনিয়ালোভী, সে অপরকেও নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। নির্জনবাসে এসব বিষয় থেকে মুক্ত থাকা যায়। যারা নির্জনবাস অবলম্বন করেছেন, তাদের উক্তি থেকেও এরূপ আভাস পাওয়া যায়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মানুষকে পরীক্ষা করে নাও, যাতে তাকে শত্রু মনে না কর। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ নির্জনবাসে কুসঙ্গী থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র (রাঃ)-কে কেউ বলল ঃ ব্যাপার কি, আপনি মদীনা মোনাওয়ারায় গমন করেন না? তিনি বললেন ঃ এখন সেখানে যারা রয়ে গেছে, তারা নেয়ামত দেখে হিংসা করে অথবা অপরের কষ্ট দেখে আনন্দিত হয়। ইবনে সাম্মাক (রহঃ) বলেন ঃ আমার এক বন্ধু আমাকে পত্রে এই বিষয়বস্তু লেখেছে– মানুষ আগে ওষুধ ছিল, যদ্দ্বারা

আমরা চিকিৎসা করতাম। কিন্তু এখন মানুষ এমন ব্যাধি হয়ে গেছে, যার কোন চিকিৎসা নেই। অতএব তাদের কাছ থেকে পলায়ন কর, যেমন সিংহ দেখে পলায়ন করে থাক। জনৈক আরব সদাসর্বদা একটি বৃক্ষের কাছে থাকত এবং বলত ঃ আমার এই সঙ্গী তিনটি স্বভাব রাখে। আমি কথা বললে সে তা অপরের কানে পৌঁছায় না। আমি তার গায়ে থুথু নিক্ষেপ করলেও সে বরদাশত করে। আমি অশালীন কাজ করলে সে ক্রুদ্ধ হয় না। হযরত হাসান বলেন ঃ আমি হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছা করলে খ্যাতনামা ওলীআল্লাহ্ সাবেত বানানী সংবাদ পেয়ে বললেন ঃ আমি আপনার সাথে হজ্জে যেতে চাই। আমি বললাম ঃ মিয়া সাহেব, আল্লাহর দেয়া পর্দার মধ্যে থাকাই আমাদের জন্য উত্তম। আমার আশংকা হয়, এক সাথে থাকলে একের কাছে অপরের এমন অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়বে, যাতে শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে। এসব উক্তি থেকে নির্জনবাসের আর একটি উপকারিতা জানা যায়। তা হল দ্বীনদারী, সৌজন্য, চরিত্র, ফকিরী ইত্যাদির সুনাম অক্ষুণ্ন থাকে এবং দোষ গোপন থাকে। মানুষ তার দ্বীন ও দুনিয়ার ক্রিয়াকর্মে এমন দোষ অবশ্যই রাখে, যা গোপন রাখাই ইহকাল ও পরকালে তার জন্যে উপযুক্ত। এই দোষ প্রকাশ হয়ে পড়লে নিরাপত্তা বাকী থাকে না। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ আগেকার লোক কাঁটাবিহীন পত্র ছিল; কিন্তু আজকালকার লোক পত্রবিহীন কাঁটা। হযরত আবু দারদার যমানা ছিল প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ। তখন যদি এই অবস্থা হয়, তবে তাঁর পরবর্তীকালে অবস্থা যে আরও শোচনীয় হবে, তা বলাই বাহুল্য।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি মালেক ইবনে দীনারের খেদমতে পৌঁছে দেখি তিনি একাকী বসে আছেন। একটি কুকুর তাঁর উরুতে মাথা রেখে শুয়ে আছে। আমি কুকুরটিকে তাড়াতে চাইলে তিনি বললেন ঃ একে কিছু বলো না। সে কাউকে কষ্ট দেয় না। সে কুসঙ্গীর চেয়ে উত্তম। হযরত আবু দারদা (রাঃ) আরও বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং লোকজন থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তারা উটে আরোহণ করলে উটের পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়, ঘোড়ায় সওয়ার হলে তার কোমর ব্যথিত করে এবং ঈমানদারদের অন্তরে স্থান করলে তাকে বিনষ্ট করে দেয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ পরিচিতজনের সংখ্যা হ্রাস কর। তোমার অন্তর ও দ্বীনদারী নিরাপদ থাকবে। হক হালকা হবে। কারণ, পরিচিতজন যত বেশী হবে, হকও ততই বেশী হবে এবং সকল হক আদায় করা দুঃসাধ্য হবে। অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ যাকে চেন, তার কাছে অপরিচিত হয়ে যাও এবং যাকে

চেন না, তার সাথে আর পরিচয় করো না।

নির্জনবাসের পঞ্চম উপকারিতা হচ্ছে, এর ফলে কেউ তোমার কাছে কিছু আশা করবে না এবং তুমিও অন্যের কাছে আশা করবে না। মানুষের আশা ছিন্ন হওয়া একটি নেহায়েত উপকারী বিষয়। কেননা, মানুষকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করা সম্ভবপর নয়। কাজেই নিজের সংশোধনে ব্যাপৃত থাকাই উত্তম। নিম্নতম ও সহজ হক হচ্ছে জানাযায় যাওয়া, অসুখে-বিসুখে হাল জিজ্ঞেস করা, ওলীমা ও বিবাহ মজলিসে উপস্থিত হওয়া। এগুলোর মধ্যে আছে অনর্থক সময় নষ্ট করা এবং বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়া। মাঝে মাঝে এমনও হয়, মানুষ এগুলোর মধ্যে কতক হক আদায় করতে সক্ষম হয়। ওযর যদিও গ্রহণীয় হয়ে থাকে, কিন্তু কতক ওযর প্রকাশ করার যোগ্য হয় না। ফলে হকদার এ কথাই বলে, তুমি অমুকের হক আদায় করেছ এবং আমার হক আদায় করনি। এটাই শত্রুতার কারণ হয়ে যায়। সেমতে বলা হয়, যে ব্যক্তি রোগীর হাল জিজ্ঞেস করে না, সে চায়, রোগী মারা যাক, যাতে আরোগ্য লাভের পর তার কাছে লজ্জিত হতে না হয়। যে ব্যক্তি কারও সুখে-দুঃখে শরীক হয় না তার প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু যে একজনের কাজে শরীক হয় এবং অন্য জনের কাজে শরীক হয় না, তাকে কেউ ভাল বলে না। যদি কেউ দিবারাত্র সর্বক্ষণ হক আদায়ে ব্যাপৃত থাকে, তবুও সকল হক আদায় করতে পারবে না। যার দ্বীন অথবা দুনিয়ার কোন ব্যস্ততা আছে, সে কিরূপে সকল হক আদায় করবে? হযরত আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন ঃ বন্ধু-বান্ধব বেশী থাকার মানে কর্জদাতা বেশী থাকা; অর্থাৎ, বন্ধু-বান্ধব যত বেশী হবে, তত বেশী হক আদায় করতে হবে। অন্যের কাছ থেকে তোমার আশা বিচ্ছিন্ন হওয়াও কম উপকারী বিষয় নয়। কেননা, যে ব্যক্তি দুনিয়ার বাহার ও সাজসজ্জা দেখে, তার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বাসনা থেকে লালসার উৎপত্তি হয়। অধিকাংশ লালসায় ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। ফলে কষ্ট ভোগ করতে হয়। নির্জনবাস অবলম্বন করলে দেখার সুযোগ হবে না। ফলে লোভ-লালসাও হবে না। এ কারণে আল্লাহ্ বলেনঃ

ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم

অর্থাৎ, বিভিন্ন মানুষকে আমি যে ভোগ্যসামগ্রী দান করেছি, তুমি তার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করো না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

انظروا الى من هو دونكم ولاتنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر ان لاتزدروا نعمة الله عليكم

অর্থাৎ, তার দিকে তাকাও, যে তোমার চেয়ে কম এবং তার দিকে তাকিয়ো না, যে তোমার চেয়ে বেশী। এটা তোমার উপর আল্লাহ্র নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে না করার পক্ষে সহায়ক।

আওন ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ আমি প্রথমে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে বসতাম। ফলে সর্বদা মনঃক্ষুণ্ণ ও উদাস থাকতাম। এরপর আমি ফকীরদের সংসর্গ অবলম্বন করলাম। এখন বেশ সুখে আছি। কথিত আছে, মুযনী (রহঃ) একদিন ফুসতাতের জামে মসজিদের দরজা দিয়ে বের হচ্ছিলেন, এমন সময় ইবনে আবদুল হাকাম তার বাহিনী সমভিব্যাহারে সেখান দিয়ে গমন করল। মুযানী তার অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون আমি তোমাদের একজনকে অন্যজনের জন্যে পরীক্ষা করেছি তোমরা সবর কর কি না তা দেখার জন্যে।

মুযনী বললেন ঃ হাঁ আমি সবর করব। তিনি ছিলেন নিঃস্ব ব্যক্তি। মোট কথা, যে আপন গৃহে থাকে, সে এ ধরনের পরীক্ষায় পড়ে না।

নির্জনবাসের ষষ্ঠ উপকারিতা হচ্ছে, এতে অভদ্র ও নির্বোধদেরকে দেখা এবং তাদের নির্বুদ্ধিতার কষ্টভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এরূপ লোকদেরকে দেখা যেন অর্ধেক অন্ধত্ব। আ'মাশকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার চক্ষু ঝলসে গেছে কেন? তিনি বললেন ঃ ঝগড়াটে লোকেদেরকে দেখার কারণে। কথিত আছে, ইমাম আবু হানীফাও আ'মাশের কাছে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা যার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন, এর বিনিময়ে তাকে দৃষ্টিশক্তির চেয়ে উত্তম বস্তু দান করেন। আপনি বিনিময়ে কি পেয়েছেন? আ'মাশ রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন ঃ চোখের বিনিময়ে আমাকে এই দিয়েছেন যে, আমাকে ভারী লোকদের দেখা থেকে রক্ষা করেছেন। আপনিও তাদের একজন। ইবনে সীরীন বর্ণনা করেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছিল, একবার ভারী ব্যক্তিকে দেখে সে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল।

প্রথমোক্ত উপকারিতা বাদে বাকীগুলো জাগতিক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু ধর্মের সাথেও এগুলোর সম্পর্ক হতে পারে। কেননা, মানুষ যখন ভারী লোককে দেখে কষ্ট পাবে, তখন তার গীবত করতে শুরু করবে। এটা পরিণামে ধর্মের জন্যে অনিষ্টকর। নির্জনবাসে এসব অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকা যায়।

অনিষ্ট ঃ এখন আমরা নির্জনবাসের অনিষ্ট বর্ণনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

প্রকাশ থাকে যে, যে সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য অপরের সাহায্যে অর্জিত হয়, সেগুলো মেলামেশা ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। বলাবাহুল্য, নির্জনবাস অবলম্বন করলে এ সকল উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যাবে। এগুলোর ফওত হওয়াই নির্জবাসের ক্ষতি। এখন মেলামেশার উপকারিতাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, নির্জনবাসের কারণে এতগুলোর উপকারিতা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এগুলোই হচ্ছে নির্জনবাসের অনিষ্ট তথা বিপদ। নিম্নে বিপদগুলো এক একটি করে বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

নির্জনবাসের প্রথম বিপদ হচ্ছে, এতে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ ফওত হয়ে যায়, যার ফযীলত আমরা এলেম অধ্যায়ে বর্ণনা করে এসেছি। এই উভয় কাজ দুনিয়াতে বড় এবাদতসমূহের অন্যতম। মেলামেশা ছাড়া এগুলো সম্ভবপর নয়। হাঁ, এটা ঠিক যে, শিক্ষার অনেক প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে কতক জরুরী নয়। যে শিক্ষা অর্জন করা মানুষের উপর ফরয, তা যদি না শেখে এবং নির্জনবাস অবলম্বন করে, তবে গোনাহগার হবে। যদি ফরয পরিমাণে শিখে নেয়, এরপর এবাদত করতে মনে চায়, তবে নির্জনবাস করতে দোষ নেই। আর যদি কেউ বর্ণনাগত ও যুক্তিগত সকল শিক্ষায় পূর্ণতা অর্জন করার ক্ষমতা রাখে, তার জন্যে সেগুলো শিক্ষা করার পূর্বে নির্জনবাস অবলম্বন করা নেহায়েত ক্ষতির কথা। এ কারণেই ইবরাহীম নখয়ী ও অন্যান্য বুযুর্গ বলেন ঃ প্রথমে আলেম হও, এরপর নির্জনবাসী হও। যে ব্যক্তি শিক্ষা লাভের পূর্বে নির্জনবাসী হয়, সে প্রায়ই নিদ্রায় অথবা অন্য কোন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চিন্তায় আপন মূল্যবান সময় বিনষ্ট করে। বেশীর বেশী সে সম্পূর্ণ সময় ওযিফার মধ্যে ডুবে থাকে এবং দৈহিক আমল করতে থাকে; কিন্তু অন্তর নানারকম প্রবঞ্চনার মাধ্যমে তার প্রচেষ্টা নিষ্ফল এবং আমল বাতিল করতে থাকে; অথচ সে টেরও পায় না। সে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও সিফাতের বিশ্বাসে নানা কুসংস্কারের আশ্রয় নিয়ে মন ভুলিয়ে রাখে এবং প্রায়ই নানা দুষ্ট কুমন্ত্রণার সম্মুখীন হয়। ফলে সে শয়তানের ক্রীড়নকে পরিণত হয় এবং মনে মনে নিজেকে "আবেদ" মনে করতে থাকে। মোট কথা, শিক্ষা ধর্মকর্মের মূল শিকড় এবং অজ্ঞ জনসাধারণ ও মূর্খদের নির্জনবাসে কোন কল্যাণ নেই। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নির্জনে এবাদত করার নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত নয় এবং নির্জনে কি কি বিষয় জরুরী, তা জানে না, তার নির্জনবাসে কোন উপকার নেই। কেননা, মানুষের নফস রোগীর মতই বিচক্ষণ ডাক্তারের চিকিৎসার মুখাপেক্ষী। যদি কোন মূর্খ রোগী

চিকিৎসা শাস্ত্র না শেখে এবং ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে থাকে, সে নিঃসন্দেহে কেবল রোগযন্ত্রণাই ভোগ করে যাবে। সুতরাং আলেম ব্যতীত অন্য কারও জন্যে নির্জনবাস সমীচীন নয়। শিক্ষাদান কার্যেও বিরাট সওয়াব আছে, যদি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের নিয়ত সঠিক হয়। এ যুগে আলেমরা যদি ধর্মের নিরাপত্তা কামনা করে, তবে নির্জনবাস অবলম্বন করুক। কেননা, আজকাল এমন কোন শিক্ষার্থী দৃষ্টিগোচর হয় না, যে ধর্মের উপকারের জন্যে শিক্ষা গ্রহণ করে। আজকাল শিক্ষার্থীরা কেবল মসৃণ কথাবার্তা অন্বেষণ করে, যদ্দ্বারা ওয়াযে জনসাধারণকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে অথবা সমসাময়িকদেরকে পেছনে ফেলে দেয়ার জন্যে, শাসকবর্গের নৈকট্য লাভের জন্যে এবং গর্ব ও আত্মম্ভরিতার স্থলে ব্যবহার করার জন্যে তারা মুনাযারা তথা বিতর্কের বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে। ফেকাহ্ সম্বন্ধীয় রেওয়ায়েতসমূহের উপর ভিত্তি করে ফতোয়াদান শিক্ষা আজকাল সর্বাধিক জনপ্রিয়। কিন্তু প্রায়শঃ সমসাময়িকদের অগ্রে থাকা এবং সরকারী পদ লাভ করে অর্থ সঞ্চয় করাই এ শিক্ষা অর্জনের কারণ হয়ে থাকে। অতএব এ ধরনের শিক্ষার্থীদের থেকে বেঁচে থাকাই ধর্ম ও সাবধানতার দাবী। যদি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়, যে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে শিক্ষা গ্রহণ করে, তার কাছে শিক্ষা গোপন করা কবীরা গোনাহ। এরূপ শিক্ষার্থী পাওয়া গেলেও বড় বড় শহরে দু'একজনের বেশী পাওয়া যায় না। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ আমরা অন্য উদ্দেশে শিক্ষা গ্রহণ করেছি; কিন্তু আমাদের শিক্ষা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উদ্দেশের জন্য নিবেদিত হতে অস্বীকার করেছে। এ উক্তি দ্বারা ধোঁকা খেয়ে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, আলেম ব্যক্তি অন্য উদ্দেশে এলেম শিক্ষা করলেও পরবর্তীতে তারা আল্লাহ্র দিকে রুজু করে। কেননা, অধিকাংশ আলেমের অবস্থা আমাদের সামনেই রয়েছে। তারা দুনিয়ার অন্বেষণেই মৃত্যুবরণ করে এবং এ লালসায়ই জীবনপাত করে। সংসারবিমুখ আলেম খুব কমই দেখা যায়। এখন আমরা শুনা কথার উপর ভরসা করব, না দেখা ঘটনা বিশ্বাস করব। কথায় বলে, শুনা কথা দেখা ঘটনার মত বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। এছাড়া সুফিয়ান সওরী যে শিক্ষার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেটা হচ্ছে হাদীস, তফসীর এবং পয়গম্বর ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিত শিক্ষা। এসব শিক্ষা খোদাভীতির কারণ হয়ে থাকে। এগুলো আপাততঃ প্রভাবশালী না হলেও পরবর্তীতে প্রভাবশালী হয়ে থাকে। কিন্তু কালাম ও ফেকাহ্ শিক্ষা এরূপ নয়। এগুলো যারা দুনিয়া লাভের নিয়তে শিক্ষা করে, তারা আজীবন

দুনিয়ালোভীই থেকে যায়। সম্ভবতঃ এই কিতাবে আমরা যেসব বিষয় লিপিবদ্ধ করেছি, যদি শিক্ষার্থী দুনিয়ালাভের নিয়তেই এগুলো শিক্ষা করে, তবে তাকে অনুমতি দেয়া যায়। কেননা, আশা করা যায়, শেষ বয়সে সে সঠিক পথে ফিরে আসবে। কারণ, এই কিতাব আল্লাহ্ তাআলার ভয় সৃষ্টি করা, আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করা এবং দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। এসব বিষয়বস্তু হাদীস ও কোরআনে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। কালাম ও ফেকাহ্ শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায় না।

সুতরাং শিষ্য সংখ্যা কম করা এবং নির্জনবাস অবলম্বন করার মধ্যেই সবধানতা নিহিত। যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের নিয়তে শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত, তার জন্যে এ যুগে আপন কাজ পরিত্যাগ করাই উত্তম। কেননা, আবু সোলায়মান খাত্তাবী এ যুগের সঠিক চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন- যারা তোমার কাছে বসতে এবং পড়াশুনা করতে আগ্রহী, তাদেরকে বর্জন কর। তুমি তাদের কাছ থেকে অর্থ ও সুনাম কিছুই পাবে না। তারা বাহ্যতঃ বন্ধু হলেও অন্তরে দুশমন। যখন তোমাকে দেখে, তখন খোশামোদ করে এবং পশ্চাতে মন্দ বলে। কাছে এসে তোমার ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করে এবং বাইরে গিয়ে তোমার কুৎসা রটনা করে। শিক্ষা অর্জন করা এদের উদ্দেশ্য নয়; বরং জাঁকজমক ও অর্থোপার্জনই এদের লিপ্সা। তারা তোমাকে নিজেদের মতলব হাসিলের সিঁড়ি বানাতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য সাধনে তোমার পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি হয়ে গেলে তারা তোমার ঘোর শত্রু হয়ে যায়। তারা চায়, তুমি তোমার ইযযত, ধর্ম সব তাদের জন্যে ব্যয় কর। অর্থাৎ, তাদের শত্রুকে শত্রু মনে কর এবং তাদের প্রবঞ্চনায় সাহায্য কর। তাদের মর্জি, তুমি আলেম হয়ে তাদের জন্যে বোকা হও এবং অনুসৃত ও সরদার হয়ে তাদের হীন অনুসারী হও। এ কারণেই বলা হয়, অজ্ঞদের থেকে সরে থাকা পূর্ণ মনুষ্যত্ব।

নির্জনবাসের দ্বিতীয় বিপদ, এতে নিজে উপকার লাভ করা ও পরোপকার করা ফওত হয়ে যায়। নিজে উপকার লাভ করা লেনদেনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এটা মেলামেশা ছাড়া সম্ভব নয়। অতএব যে ব্যক্তি লেনদেন ও উপার্জনের মুখাপেক্ষী, সে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নির্জনবাস বর্জনকারী হবে। লেনদেনে যদি শরীয়তের নিয়ম কানূন মেনে চলতে চায়, তবে মেলামেশা সুকঠিন হবে। যদি কারও কাছে এই পরিমাণ সম্পদ থাকে যে, মিতব্যয়ী হলে যথেষ্ট হয়ে যাবে, তবে তার জন্যে নির্জনবাস উত্তম। কেননা, এখন গোনাহ ছাড়া জীবিকা উপার্জনের কোন পথ নেই। হাঁ, যদি কেউ হালাল উপায়ে উপার্জন করে দান-খয়রাত করতে চায়, তবে

তা সেই নির্জনবাস থেকে উত্তম, যা কেবল নফল এবাদতের জন্যে অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সেই নির্জনবাস থেকে উত্তম নয়, যা আল্লাহর মারেফত ও শরীয়ত শাস্ত্রের গবেষণার জন্যে অবলম্বন করা হয়। পরোপকার অর্থ ব্যয় করে অথবা দৈহিক খেদমতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, খাঁটি নিয়তে পারিশ্রমিক ছাড়া মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানোর অশেষ সওয়াব আছে। কিন্তু মেলামেশা ছাড়া এটা হতে পারে না। অতএব যে মানুষের কাজ করে দিতে সক্ষম, এর সাথে শরীয়তের সীমাও লঙ্ঘন না করে, তার জন্যে মেলামেশা নির্জনবাসের তুলনায় উত্তম।

নির্জনবাসের তৃতীয় বিপদ, এতে সংশোধিত হওয়া ও সংশোধন করা ফওত হয়ে যায়। সংশোধিত হওয়া দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য নফসের সাধনা করা এবং মানুষের জ্বালাতন সহ্য করা, যাতে নফস শিথিল হয়ে যায় এবং কামভাব দমিত হয়। নফসের এরূপ হওয়াও মেলামেশা ছাড়া হতে পারে না। যার চরিত্র মার্জিত নয় এবং কামভাব শরীয়তের সীমার অনুগত নয়, তার জন্যে নির্জনবাসের চেয়ে মেলামেশা উত্তম। এ কারণেই খানকায় যারা সূফীদের খেদমত করে, তারা এ কাজটি ভাল বুঝে। মানুষের কাছে সওয়াল করার কারণে তাদের নফসের অহমিকা চূর্ণ হয়ে যায় এবং সূফীগণের দোয়া দ্বারা বরকত লাভ হয়। অতীত যুগের শুরুতে এ খেদমতের এটাই ছিল কারণ। এখন এতে কুউদ্দেশ্য শামিল হয়ে গেছে। এখন খেদমতের জন্যে বলার কারণ হচ্ছে অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অনেক ধনসম্পদ লাভ করা। যদি খেদমতের নিয়ত তাই হয়, তবে এর চেয়ে নির্জনবাসই উত্তম, যদিও কোন কবরের কাছে হয়। আর যদি বাস্তবেই নফসের অহমিকা দূর করার নিয়ত থাকে, তবে সে সাধনার মুখাপেক্ষী, তার জন্যে এই খেদমত নির্জনবাসের তুলনায় উত্তম। আধ্যাত্ম পথের শুরুতে সাধনার প্রয়োজন হয়। সাধনা অর্জিত হওয়ার পর এটা বুঝতে হবে যে, ঘোড়াকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশেই শিক্ষা দেয়া হয় না; বরং পথ অতিক্রমের জন্যে সওয়ারী করা এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়ার জন্যে শিক্ষা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে মানুষের দেহ তার অন্তরের সওয়ারী। এতে সওয়ার হয়ে অন্তর আখেরাতের পথ অতিক্রম করে। এতে অনেক কামনা-বাসনা আছে বিধায় সওয়ারী পথিমধ্যে অবাধ্য হয়ে যেতে পারে। তাই সাধনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য সওয়ারীই। সুতরাং কেউ যদি সারা জীবন সাধনার মধ্যে অতিবাহিত করে দেয়, তবে সে হবে সেই ব্যক্তির মত, যে সারা জীবন ঘোড়াকে শিক্ষা দেয় এবং তার

পিঠে সওয়ার হয়ে পথ অতিক্রম করে না। এমতাবস্থায় ঘোড়ার শিক্ষিত হওয়ার উপকার এটাই হবে যে, সে ঘোড়ার কামড় ও লাথি মারা থেকে নিরাপদ থাকবে। যদিও এ উপকারটিও উদ্দেশ্য; কিন্তু এরূপ উপকার তো মৃত জন্তু থেকেও অর্জিত হয়। ঘোড়া তো রাখা হয় সেটির দ্বারা জীবনে কিছু কাজ নেয়ার জন্যে। এমনিভাবে দেহের কামনা বাসনা থেকে মুক্তি তো নিদ্রা ও মৃত্যু দ্বারাও অর্জিত হয়। কিন্তু কেবল কামনা বাসনা বর্জনই উদ্দেশ্য নয়; বরং এরপর আখেরাতের পথ অতিক্রম করাও উদ্দেশ্য। সুতরাং কামনা বাসনা বর্জন ও কেবল সাধনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা মানুষের উচিত নয়। কাজেই সাধনার পর কি করতে হবে, সেটা দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে। এ পর্যায়ে এসে নির্জনবাস তার জন্যে মেলামেশার তুলনায় অধিক সহায়ক হবে। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির জন্যে শুরুতে মেলামেশা উত্তম এবং পরিণামে নির্জনবাস উত্তম।

সংশোধন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য অপরকে সাধনায় লিপ্ত করা; যেমন মুরশিদগণ সূফীগণের সাথে করে থাকেন। এটাও মেলামেশা ছাড়া হতে পারে না। অর্থাৎ মুরশিদ যে পর্যন্ত মুরীদদের সাথে মেলামেশা না করে, তাদের সংশোধন করতে সক্ষম হবে না।

নির্জনবাসের চতুর্থ বিপদ, এতে অপরের কাছ থেকে বন্ধুসুলভ সঙ্গ হাসিল করা ও অপরকে বন্ধুসুলভ সঙ্গ দেয়া ফওত হয়ে যায়। এটা সেই ব্যক্তির কাম্য হয়, যে ওলীমা, ভোজসভা ও মনোরঞ্জনের জায়গায় যায় না। এর পরিণাম বিলাসগত আনন্দ এবং কখনও ধর্মপরায়ণতাও হয়ে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি মাশায়েখের কাছ থেকে সঙ্গ হাসিল করে এ কারণে যে, তারা সর্বদা খোদাভীতি ও পরহেযগারীর মধ্যে মগ্ন থাকে। কাজেই তাদের কথাবার্তা ও অবস্থা দেখে বন্ধুসুলভ সঙ্গ লাভ করা মোস্তাহাব।

নির্জনবাসের পঞ্চম বিপদ, মানুষ নিজে সওয়াব পাওয়া ও অপরকে সওয়াব পৌঁছানো থেকে বঞ্চিত থাকে। নিজে সওয়াব পাওয়ার উপায় হচ্ছে জানাযায় যাওয়া, রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করা, ঈদের নামাযে শরীক হওয়া, জুমুআয় উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি। যে নির্জনবাস করে, তার জন্যে সকল নামাযের জামাতে যোগদান করা জরুরী। জামাত বর্জন করার অনুমতি কোন অবস্থাতেই নেই। হাঁ, জামাতের সওয়াব না পাওয়ার সমতুল্য কোন বাহ্যিক ক্ষতির আশংকা থাকলে জামাত বর্জন করা যায়। কিন্তু এরূপ কমই হয়ে থাকে। অপরকে সওয়াব পৌঁছানোর উপায়, নিজের দরজা খোলা রাখবে, যাতে রুগ্ন অবস্থায় মানুষ এসে তার হাল

জিজ্ঞেস করে এবং বিপদে সান্ত্বনা ও আনন্দে মোবারকবাদ দেয়। কেননা, এতে মানুষ সওয়াব পায়।

নির্জনবাসের ষষ্ঠ বিপদ, এতে বিনয় ফওত হয়ে যায়। নির্জনতা অবলম্বনের কারণ কখনও অহংকারও হয়ে থাকে। বনী ইসরাঈলের জনৈক দার্শনিক দর্শন শাস্ত্রে তেষট্টিটি পুস্তক রচনা করেছিল। এরপর তার ধারণা হল, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তার নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন, অমুক ব্যক্তিকে বলে দাও সে তার বকবক দ্বারা সারা পৃথিবী ভরে দিয়েছে। আমি এর মধ্য থেকে কিছুই কবুল করি না। দার্শনিক নির্জনবাস অবলম্বন করল এবং মাটির নিচে কুঠরীতে চলে গেল। অতঃপর মনে মনে বলল ঃ আমি এবার পরওয়ারদেগারের মহব্বতে পৌঁছে গেছি। আল্লাহ তাআলা নবীর প্রতি আবার ওহী পাঠালেন, তাকে বলে দাও, সে আমার সন্তুষ্টি পাবে না যে পর্যন্ত মানুষের সাথে মেলামেশা এবং তাদের জ্বালাতন সহ্য না করে। অতঃপর সে মানুষের সাথে মেলামেশা করল, তাদের কাছে বসল, সঙ্গে আহার করল এবং বাজারে ঘুরাফেরা করল। তখন আল্লাহ তা'আলা নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন, তাকে বলে দাও, সে আমার সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, কিছু লোকের নির্জনবাসের কারণ অহংকারই হয়ে থাকে। তারা এজন্যে মজলিসে যায় না যে, কেউ তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে না এবং অগ্রে বসাবে না। কিংবা তারা মনে করে, মানুষের সাথে মেলামেশা না করলে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। কিছু লোক এ জন্যে নির্জনবাস অবলম্বন করে যে, মেলামেশার কারণে তাদের গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং দরবেশী ও এবাদতের যে বিশ্বাস তাদের প্রতি রয়েছে, তা খতম হয়ে যাবে। ফলে তারা তাদের গৃহকে আপন কুকর্মের জন্যে আড়াল করে নেয়। তারা গৃহে কোন সময়ই যিকির ফিকিরে ব্যয় করে না। তাদের পরিচয় হচ্ছে, স্বয়ং কারও কাছে যাওয়া পছন্দ করে না; কিন্তু অন্যরা তাদের কাছে আসুক, এটা খুব কামনা করে। বরং জনসাধারণ ও আমীর ওমরারা তাদের দরজায় সমবেত হলে এবং তাদের হস্ত চুম্বন করলে তারা অত্যন্ত খুশী হয়। এসব লোক যদি এবাদতে মশগুল থাকার কারণে মেলামেশা ঘৃণা করত, তবে নিজের যাওয়া যেমন তাদের কাছে ভাল মনে হত না, তেমনি অপরের আগমনও তারা অপছন্দ করত; যেমন ফোযায়ল (রহঃ)-এর অবস্থা এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে, তিনি বন্ধুকে দেখে বললেন ঃ তুমি শুধু এ জন্যে এসেছ যে, আমি তোমার সামনে সেজে বসে থাকি

এবং তুমি আমার সামনে। অথবা যেমন হাতেম আসাম্ম তাঁর সাথে সাক্ষাৎকামী আমীরকে বলেছিলেন ঃ আমার প্রয়োজন, না আমি তোমাকে দেখব, না তুমি আমাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি একাকিত্বে আল্লাহর যিকিরে মশগুল নয়, তার নির্জনবাসের কারণ এটাই যে, সে অতি মাত্রায় মানুষের সাথে মশগুল আছে; অর্থাৎ তার মন চায়, মানুষ তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখুক। এরূপ নির্জনবাস কয়েক কারণে মূর্খতা। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি শিক্ষা ও ধর্মকর্মে বড় হয়, মেলামেশা ও বিনয়ের কারণে তার মর্যাদা হ্রাস পায় না। সেমতে হযরত আলী (রাঃ) খোরমা ও লবণ বাজার থেকে আপন কাপড়ে ও হাতে বহন করে আনেন। হযরত আবূ হোরায়রা, হোযায়ফা, উবাই ইবনে কাব ও ইবনে মসউদ (রাঃ) খড়ির বোঝা ও আটার পুটলি কাঁধে বহন করে আনতেন। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) যখন শাসনকর্তা ছিলেন, তখন খড়ির বোঝা মাথায় বহন করে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন– তোমাদের আমীরকে পথ দাও। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সওদা ক্রয় করতেন এবং নিজেই গৃহে নিয়ে যেতেন। কোন কোন সাহাবী আরজ করতেন, আমার হাতে দিন। আমি নিয়ে যাই। তিনি বলতেন ঃ বস্তুর মালিক তা নিয়ে যাওয়ার অধিক হকদার। হযরত ইমাম হাসান (আঃ) ভিক্ষুকদের কাছ দিয়ে গমন করতেন। তারা রুটির টুকরা ভক্ষণ করত এবং বলত সাহেবজাদা! থামুন, আমাদের সাথে আহার করুন। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে যেতেন এবং পথে বসে তাদের সাথে আহার করতেন। এরপর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বলতেন ঃ আল্লাহ তাআলা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। দ্বিতীয়তঃ যারা মানুষের সন্তুষ্টি ও ভক্তিশ্রদ্ধা কামনা করে, তারা বিভ্রান্ত। কেননা, তারা আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থ চিনতে পারলে বুঝতে পারবে, মানুষ দ্বারা কোন কিছু হয় না। লাভ-লোকসান, উপকার ক্ষতি সমস্তই আল্লাহ তা'আলার করায়ত্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায়, আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন। সহল তস্তরী তাঁর জনৈক মুরীদকে বললেন ঃ তুমি অমুক আমল কর। মুরীদ বলল ঃ লোকলজ্জার কারণে আমি এটা করতে পারি না। তিনি সকল মুরীদকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ দু'টি গুণের মধ্য থেকে একটি গুণে গুণান্বিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ মারেফতের স্বরূপ জানতে পারে না– হয় মানুষ তার দৃষ্টি থেকে পড়ে যাবে এবং দুনিয়াতে পরওয়ারদেগারকে ছাড়া কাউকে দেখবে না, অন্য কাউকে লাভ ও ক্ষতির মালিক মনে করবে না; না হয় তার নফস তার অন্তরের সামনে তুচ্ছ হয়ে যাবে। মানুষ কি

অবস্থায় তাকে দেখবে, এ ব্যাপারে সে নফসের পরওয়া করবে না। হযরত ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ এমন কেউ নেই, যার বন্ধু ও শত্রু নেই। অতএব যে আল্লাহ্র অনুগত তার সাথে থাকা ভাল। হযরত হাসান বসরীকে কেউ বলল ঃ আপনার মজলিসে কিছু লোক আসে। উদ্দেশ্য, আপনি ওয়াযে কোথায় কোথায় ভুল করেন তা লক্ষ্য করতে এবং আপনাকে প্রশ্ন করে করে বিরক্ত করতে। তিনি মুচকি হেসে বললেন ঃ এটা খারাপ মনে করো না। আমি আমার নফসকে জান্নাতে থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতিবেশী হওয়ার জন্যে রেখেছি। আমি এ বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষী। আমি কখনও বলিনি যে, মানুষের মুখ থেকে অক্ষত থাকব। কারণ, আমি জানি, আল্লাহ তাআলা যিনি মানুষের স্রষ্টা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা এবং মৃত্যুদাতা, তিনিও মানুষ থেকে অক্ষত নন। অতএব আমি অক্ষত থাকব কিরূপে? হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে আরজ করলেন ঃ ইয়া রব, মানুষের রসনাকে আমা থেকে ফিরিয়ে রাখ। আদেশ হল ঃ হে মূসা, এটা তো এমন বিষয়ের প্রার্থনা, যা আমি নিজের জন্যে পছন্দ করিনি– তোমার জন্যে কিরূপে করব? আল্লাহ তাআলা হযরত ওযায়র (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠান- আমি তোমাকে মানুষের মুখে মেসওয়াকের মত করব, তারা তোমাকে চর্বণ করবে– এটা যদি তুমি পছন্দ না কর, তবে তোমাকে আমার কাছে বিনয়ীদের মধ্যে লেখব না। সারকথা, মানুষ ভাল বিশ্বাস রাখুক, সাধু বলুক, এ উদ্দেশে যে ব্যক্তি নিজেকে গৃহে আবদ্ধ রাখে, সে দুনিয়াতেও ক্লেশ ভোগ করে এবং আখেরাতেও আযাব থেকে নিস্তার পাবে না। নির্জনবাস এমন ব্যক্তির জন্যেই মোস্তাহাব, যে সদা-সর্বদা পরওয়ারদেগারের যিকির, ফিকির, এবাদত ও মারেফতে ডুবে থাকে।

নির্জনবাসের সপ্তম বিপদ, এতে অভিজ্ঞতা ফওত হয়ে যায়, যা মানুষের সাথে মেলামেশা ও তাদের প্রাত্যহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উপর নির্ভরশীল। বুদ্ধি-বিবেক, ইহকাল ও পরকালের উপযোগিতা সম্যক উপলব্ধি করার জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং উপযোগিতা অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা দ্বারা জানা যায়। যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় পটু নয়; তার নির্জনবাসে কোন কল্যাণ নেই। তাই প্রথমে লেখাপড়া শিখতে হবে। এ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে যাবে এবং এতটুকু যথেষ্ট হবে। অবশিষ্ট অভিজ্ঞতা পরিস্থিতি সম্পর্কে শুনার মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে– মেলামেশার প্রয়োজন নেই। যেসকল অভিজ্ঞতা অধিক জরুরী, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে নিজের নফস, চরিত্র ও আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ পরীক্ষা করা। এটা নির্জনতায় হতে পারে না। উদাহরণতঃ যার মধ্যে হিংসা

বিদ্বেষ আছে, সে নির্জনে বাস করলে তার হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ পাবে না। মানুষের এসব গুণাগুণ অত্যন্ত মারাত্মক, যা পরীক্ষার মাধ্যমে দূর করা ওয়াজিব। যেসব কারণে হিংসা-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, সেগুলো থেকে দূরে থেকে হিংসা-বিদ্বেষের প্রতিকার সম্ভব নয়। কেননা, হিংসা বিদ্বেষের গুণাগুণসম্পন্ন অন্তর ফোঁড়া সদৃশ, যার মধ্যে পুঁজ ও রক্ত ভর্তি থাকে। ফোঁড়া নাড়া না দিলে কিংবা হাত না লাগালে ফোঁড়ার ব্যথা অনুভব হবে না। এখন যদি নাড়া দেয়ার কোন লোক ফোঁড়ার কাছে না থাকে, তবে যার ফোঁড়া, সে নিজেকে সুস্থই মনে করবে, কিন্তু কেউ নাড়া দিলে ফোঁড়া থেকে পুঁজ ও দূষিত পদার্থ বের হতে থাকবে; যেমন আবদ্ধ পানি ফোয়ারা দিয়ে বের হতে থাকে। এমনিভাবে যে অন্তরে হিংসা, দ্বেষ, কৃপণতা, ক্রোধ ও অন্যান্য কুচরিত্র ভর্তি থাকে, সেই অন্তরকে নাড়া দিলেই এসব কুচরিত্র ফুটে উঠতে থাকে। এ কারণেই যারা আধ্যাত্ম পথের পথিক, তারা আপন নফসের পরীক্ষা নিতেন। পরীক্ষার পর যদি নফসের মধ্যে অহংকার দেখতেন, তবে পানির মশক কোমরে বেঁধে অথবা খড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে বাজারে ফিরতেন, যাতে নফস থেকে অহংকার দূর হয়ে যায়। মোট কথা, নফসের বিপদ ও শয়তানের চক্রান্ত গোপন থাকে। খুব কম লোকই এগুলো জানে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ত্রিশ বছরের নামায পুনরায় আদায় করেছিলেন; অথচ এগুলো তিনি জামাতের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আদায় করেছিলেন। এই পুনরায় পড়ার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ একদিন আমি ওযরবশতঃ পেছনে পড়ে গেলাম এবং প্রথম সারিতে স্থান পেলাম না। আমি দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়ালাম। পেছনে পড়ার কারণে কিছু লোক আমার দিকে তাকাচ্ছিল। এতে আমার নফস লজ্জা অনুভব করছিল। তখন আমি জানলাম, আমার অতীত নামাযগুলো রিয়া মিশ্রিত ছিল। সারকথা, মেলামেশার একটি বড় ও সুস্পষ্ট উপকারিতা হচ্ছে, এতে নিন্দনীয় গুণসমূহ জানা হয়ে যায়। এ জন্যেই বলা হয়, সফর চরিত্র প্রকাশ করে দেয়। কেননা, সফরও এক প্রকার মেলামেশা– যা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়।

নির্জনবাসের উপকারিতা ও বিপদাপদ জানার পর একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নির্জনবাস উত্তম কিংবা উত্তম নয়– সর্বাবস্থায় একথা বলা নিতান্তই ভুল; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তার অবস্থা, তার সঙ্গী ও সঙ্গীর অবস্থা দেখা উচিত। আরও দেখা উচিত, মেলামেশার কারণ কি এবং মেলামেশার কারণে কোন্ কোন্ উপকারিতা হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং কি উপকার পাওয়া যাবে? এরপর উপকার ও ক্ষতি তুলনা করতে হবে। তখন

গিয়ে সত্য বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে এবং কোন্‌টি উত্তম তা জানা যাবে। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য চূড়ান্ত মীমাংসা। তিনি বলেন ঃ হে ইউনুস, মানুষের কাছে সংকুচিত হয়ে থাকা শত্রুতার কারণ এবং তাদের সাথে অধিক খোলামেলা থাকা অসৎ সঙ্গী সৃষ্টি করে। অতএব এমনভাবে থাকা উচিত, না সংকুচিত, না খোলামেলা। শেখ সা'দী (রহঃ) বলেন ঃ

نه چند ان درشتی کن که از تو سیر
گردندنه چند ان نرمی که برتو دلیر

অর্থাৎ, মানুষের সাথে এতটুকু কঠোরতা করো না যে, তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যায় এবং এতটুকু নম্রতাও করো না যে, তোমার মাথায় চড়ে বসে।

মোট কথা, মেলামেশা ও নির্জনবাসের মধ্যে সমতা আবশ্যক। এটা অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে এবং উপকারিতা ও বিপদাপদ দেখে নিলে উত্তম পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। এ সম্পর্কে সত্য ঠিক এটাই। এছাড়া কেউ কেউ যা বলেছে, তা অসম্পূর্ণ; বরং প্রত্যেকেই এমন বিশেষ অবস্থা উল্লেখ করেছে, যার মধ্যে সে নিজে রয়েছে। অন্য ব্যক্তি, যে এ অবস্থার মধ্যে নয়, তার সম্পর্কে একথা বলা ঠিক হবে? বাহ্যিক শিক্ষায় সুফী ও আলেমের মধ্যে এটাই পার্থক্য। সুফী সেই বক্তব্যই পেশ করে, যে অবস্থার মধ্যে সে নিজে থাকে। এ কারণে মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে সুফীদের জওয়াব বিভিন্ন হয়। পক্ষান্তরে আলেম বাস্তব ক্ষেত্রে যা সত্য, তাই উদঘাটন করে এবং নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে না। এ কারণে আলেম যা বলে, তাই সত্য হয়। এতে বিরোধের অবকাশ থাকতে পারে না। কেননা, সত্য সর্বদা একই হবে আর অসত্য অনেক হয়ে থাকে। এসব কারণেই সুফী বুযুর্গগণকে যখন দরবেশী কি, জিজ্ঞেস করা হল, তখন প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন জওয়াব দিলেন। সেই জওয়াব যদিও জওয়াবদাতার অবস্থানুসারে সত্য; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সত্য নয়। কেননা, সত্য তো এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ আবু আবদুল্লাহ্‌কে দরবেশী কি, জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ নিজের উভয় আস্তিন প্রাচীরে মেরে বলা– আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা, এটাই দরবেশী। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ) এর জওয়াবে বলেন ঃ দরবেশ সে ব্যক্তি, যে সওয়াল করে না এবং কারও অসুবিধা সৃষ্টি করে না। তার সাথে কেউ ঝগড়া করলে সে চুপ হয়ে যায়। সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ দরবেশ সেই ব্যক্তি, যে সওয়াল করে না এবং সঞ্চয় করে না।

অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ দরবেশী হচ্ছে তোমার কাছে কিছু না থাকা। কোন সময় থাকলেও তাকে নিজের মনে না করা। ইবরাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন ঃ দরবেশী হচ্ছে অভিযোগ না করা এবং নেয়ামত প্রকাশ করা। উদ্দেশ্য, যদি একশ' জনকে জিজ্ঞেস করা হয়, তবে একশ'টি ভিন্ন ভিন্ন জওয়াব পাওয়া যাবে। সম্ভবতঃ দু'টি জওয়াবও একরকম হবে না। কিন্তু কোন না কোন দিক দিয়ে সবগুলো জওয়াবই সঠিক হবে। কেননা, প্রত্যেকের জওয়াব তার অবস্থার বর্ণনা হবে। এ কারণেই এ সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তি এমন দেখা যাবে না, যাদের একজন অপরজনকে সুফীবাদে সুদৃঢ় বলে এবং তার প্রশংসা করে; বরং প্রত্যেকেই দাবী করে, সেই প্রকৃত সত্যের সাধক। কিন্তু শিক্ষার নূর যখন চমকে উঠে, তখন সবকিছু বেষ্টন করে নেয় এবং গোপনীয়তার পর্দা ফাঁস করে দেয়। কোন মতবিরোধ থাকতে পারে না। সুফীগণের মতবিরোধের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আমরা সূর্য ঢলে পড়ার সময় আসল ছায়া সম্পর্কে নানাজনের নানা উক্তি প্রত্যক্ষ করেছি। কেউ বলে গ্রীষ্মকালে ছায়া দুকদম হয়। কেউ বলে অর্ধেক কদম হয়। কেউ এতে আপত্তি করে বলে শীতকালে সাত কদম হয়। আবার কেউ পাঁচ কদম বলে। সূফীগণের জওয়াবের অবস্থাও তেমনি। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ শহরের আসল ছায়া দেখে জওয়াব দেয়। এটা সঠিক; কিন্তু অপরের জওয়াবকে ভুল আখ্যা দেয়া অন্যায়। কেননা, সে সারা বিশ্বকে নিজের শহর অথবা তার মত মনে করে নেয়। আলেম ব্যক্তি জানে, ছায়া কি কারণে ছোট বড় হয় এবং বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন হয়? নির্জনবাস ও মেলামেশার ফযীলত সম্পর্কে এতটুকু বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। এখন যদি কেউ নির্জনবাসকে নিজের জন্যে শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর নিরাপদ মনে করে, তবে তার জন্যে নির্জনবাসের আদব কি, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করে দিচ্ছি। প্রথমে নিয়ত করতে হবে, তার দ্বারা যেন অন্যের কোন অনিষ্ট না হয়। দ্বিতীয়, মানুষের যোগদান থেকে নিরাপদ থাকার নিয়ত করবে। তৃতীয়, মুসলমানদের হক আদায়ে ত্রুটি থেকে মুক্তির নিয়ত করবে। চতুর্থ, কায়মনোবাক্যে আল্লাহর এবাদতের জন্যে মুক্ত হওয়ার নিয়ত করবে। এভাবে নিয়ত করার পর নির্জনে এলেম, আমল ও যিকির ফিকিরে আত্মনিয়োগ করবে। মানুষকে অধিক আসা যাওয়া করতে বারণ করবে। নতুবা অধিকাংশ সময় একাগ্রতা হবে না। শহরের খবরাখবর শুনবে না। কেননা, খবরাখবর কানে পড়া এমন, যেমন মাটিতে বীজ পড়া, যা অবশ্যই অংকুরিত হয় এবং শিকড় ও ডালাপালা সৃষ্টি করে। এমনিভাবে খবরও মনের মধ্যে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে

এবং নানা কুমন্ত্রণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কুমন্ত্রণা থেকে অন্তর মুক্ত হওয়া নির্জনবাসের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। অল্প জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অধিক জীবিকা পেতে চাইলে বাধ্য হয়ে মেলামেশা করতে হবে। প্রতিবেশীদের জ্বালাতনে সবর করতে হবে। তারা যদি নির্জনবাসের কারণে প্রশংসা করে অথবা মেলামেশা বর্জন করার কারণে তিরস্কার করে, তবে কিছুই শুনবে না এবং আপন ধ্যানে মগ্ন থাকবে। কেননা, এসব বিষয় অল্প শুনলেও অনেক ক্ষতি করে। কোন ওযিফা পাঠ কিংবা যিকির করার সময় মনকে উপস্থিত রাখবে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতাপ, গুণাবলী, ক্রিয়াকর্ম এবং আকাশ ও পৃথিবীর রহস্য সম্পর্কে ফিকির করবে অথবা আমলের সূক্ষ্মতা ও মনের রিপুগুলোর কথা চিন্তা-ভাবনা করবে এবং এগুলোকে দমন করতে সচেষ্ট হবে। গৃহের কোন লোক অথবা একজন সৎসঙ্গীও থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে নির্জনবাসী দিনে এক ঘন্টা তার সাথে মনোরঞ্জন করে এবং উপর্যুপরি মেহনত থেকে স্বস্তি লাভ করে। নির্জনবাসে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করতে হবে। একাকিত্বে মনে বিরক্তি দেখা দিলে মনে করবে, কবরে কে সাথে থাকবে? সেখানেও তো একা থাকতে হবে। যে আল্লাহ্র যিকির ও মারেফতের সঙ্গ লাভ করে, মৃত্যুর পরও তার এই সঙ্গ বিনষ্ট হয় না; বরং এই সঙ্গের কারণে সে জীবিত ও প্রফুল্ল থাকে যেমন– শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে শহীদ হয়, তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত– পালনকর্তার রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ যে অনুগ্রহ তাদেরকে দান করেছেন, তজ্জন্যে তারা প্রফুল্ল। আল্লাহ্র জন্যে মেহনতকারী ব্যক্তিও মৃত্যুর পর শহীদ হয়। কেননা, সে-ই মুজাহিদ, যে আপন নফস ও খাহেশের বিরুদ্ধে জেহাদ করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ নফসের জেহাদই বড় জেহাদ। সাহাবায়ে কেরাম বলেন ঃ আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি; অর্থাৎ, নফসের জেহাদের দিকে।

সপ্তম অধ্যায়

সফর ও তার আদব

প্রকাশ থাকে যে, সফর ঘৃণার বস্তু থেকে নিষ্কৃতির উপায় এবং কাম্য বস্তু পাওয়ার মাধ্যমে। সফর দু'প্রকার– এক, বাহ্যিক শারীরিকভাবে স্বদেশ থেকে আলাদা হয়ে নির্জন প্রান্তরে ভ্রমণ করা এবং দুই, অন্তরগত সফর; অর্থাৎ, অন্তরের মর্ত্যলোক থেকে ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করা। উভয় প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার সফর উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি জন্মাবস্থার উপর স্থির থাকে এবং বাপদাদার কাছ থেকে যা শিখেছে তার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে ত্রুটি ও লোকসানের স্তরেই সন্তুষ্ট থাকে এবং জান্নাতের বিস্তৃত পরিমণ্ডলের বিনিময়ে বর্বরতার অন্ধকার প্রকোষ্ঠই বেছে নেয়।

এ সফরে প্রবেশ করা সুকঠিন বিধায় এর জন্যে কোন পথপ্রদর্শক ও সঙ্গী দরকার। কিন্তু একে তো পথ অজ্ঞতার, দ্বিতীয়তঃ কোন পথপ্রদর্শক নেই, তাই এ পথে কোন ভ্রমণকারী নেই এবং দিগন্ত ও ঊর্ধ্ব জগতের বিচরণ ক্ষেত্রে কোন বিচরণকারী নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ পথের দিকেই আহ্বান করেন। তিনি বলেন ঃ سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ আমি দেখিয়ে দেব তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। অন্যত্র বলেন ঃ وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ـ পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তোমরা কি দেখ না? এ সফর থেকে পশ্চাৎপদ হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ঃ

اِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ وَبِاللَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমরা তাদের কাছ দিয়ে গমন কর সকাল বেলায় এবং রাত্রে। তোমরা কি বুঝ না এবং এ আয়াতেও-

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যেগুলোর কাছ দিয়ে তারা গমন করে। কিন্তু এগুলোতে ধ্যান দেয় না।

এই সফর যে ব্যক্তির নসীব হয়, সে শারীরিকভাবে নিজ দেশে এবং বাসস্থানেই থাকে; কিন্তু অন্তর দ্বারা জান্নাতের সুবিস্তৃত বিচরণ ক্ষেত্রে বিচরণ করে। এ সফরের ঝরণায় ও ঘাটে ভয় সংকীর্ণতা নেই এবং অধিক ভিড়ের কারণে কোন ক্ষতি হয় না; বরং যাত্রীদের সংখ্যা বেশী হলে এর ফলাফল ও উপকারিতা বেশী হয়। এর চিরস্থায়ী ফলাফল থেকে কাউকে বাধা দেয়া হয় না এবং ক্রমবর্ধমান উপকারিতা থেকে নিষেধ করা হয় না। কোন যাত্রী নিজে অলসতা করলে অথবা নড়াচড়ায় বিরতি দিলে সে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। কেননা, আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে।

যারা দৈহিকভাবে সফর করে, তাদের সফরের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় জ্ঞানার্জন এবং ধর্মকর্মে সহায়তা লাভ হয়, তবে তারা আখেরাতের পথিক বলে গণ্য হবে। এরূপ সফরের কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য না করলে সফরকারী দুনিয়াদার ও শয়তানের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে এগুলোর প্রতি সদাসর্বদা লক্ষ্য রাখলে সফরকারী এমন উপকারিতা লাভ করবে, যদ্দরুন সে আখেরাত অন্বেষণকারীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। নিম্নে আমরা সফরের আদব ও শর্তসমূহ দু'টি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদব, নিয়ত ও উপকারিতা

সফর এক প্রকার গতিশীলতা ও মেলামেশার নাম। এতে অনেক উপকারিতা ও বিপদাপদ আছে। মানুষ সফর এ জন্যে করে যে, কোন বস্তু তাকে সজোরে স্বস্থান থেকে বের করে দেয়। সেই বস্তু না থাকলে সে সফর করত না। অথবা সফর করার কারণ কোন উদ্দেশ্য কিংবা কাম্য বস্তু অর্জন করা হয়ে থাকে। যে বস্তু থেকে পালিয়ে সফর করা হয়, তা কোন পার্থিব বিষয় হবে; সেমতে শহরে প্লেগ ও মহামারী থাকা কিংবা ফেতনা ও গোলযোগ থাকা, খাদ্যশস্য দুর্মূল্য হওয়া ইত্যাদি। অথবা সেই বস্তু ধর্ম সম্পর্কিত হবে। উদাহরণতঃ শহরে থাকলে জাঁকজমক ও অর্থলিপ্সার সাথে জড়িত হয়ে পড়া। এ কারণেও শহর ত্যাগ করা উচিত। যে বস্তু অর্জন করার জন্যে সফর করা হয় তাও হয় পার্থিব হবে, যেমন অর্থসম্পদ ও প্রতিপত্তির অন্বেষণ, অথবা ধর্ম সম্পর্কিত হবে। এটা হয় এলেম হবে, না হয় আমল। এলেম তিন প্রকার- এক, ফেকাহ্, হাদীস, তফসীর ইত্যাদির এলেম। দুই, চরিত্র ও গুণাবলীর এলেম। তিন, পৃথিবীর নিদর্শন ও আশ্চর্য বিষয়সমূহের এলেম; যেমন যুলকারনাইন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সফর করেছিলেন। আমল দুই প্রকার- এক এবাদত; যেমন হজ্জ, ওমরা ও জেহাদের সফর। দুই, যিয়ারতের সফর; যেমন মক্কা মদীনা ও বায়তুল মোকাদ্দাসের সফর। কখনও ওলী ও আলেমগণের যিয়ারতের উদ্দেশে সফর করা হয়। জীবিত থাকলে তাঁদেরকে দেখা বরকতের কারণ হয় এবং তাঁদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে তাঁদেরকে অনুসরণের আগ্রহ জোরদার হয়। মৃত হলে তাঁদের কবর যিয়ারত করা হয়। এই বক্তব্য অনুযায়ী সফরের যত প্রকার বের হয়, নিম্নে সবগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম প্রকার- এলেমের জন্যে সফর করা। ফরয এলেমের জন্যে সফর করলে সফরও ফরয হবে এবং নফল এলমের জন্যে সফর করলে সফরও নফল হবে। উপরে এলেমের তিন প্রকার বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে যেকোন একটির জন্যে সফর করলে সওয়াব পাওয়া যাবে। ফেকাহ্, হাদীস, তফসীর ইত্যাদি ধর্মীয় এলেম সম্পর্কে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ -

অর্থাৎ, যে আপন গৃহ থেকে এলেমের অন্বেষণে বের হয়, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে থাকে। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে-

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ -

অর্থাৎ, যে এলেমের অন্বেষণে পথ চলে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (রহঃ) একটি হাদীসের খোঁজে অনেক দিনের সফর করতেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) দশ জন সাহাবীসহ মদীনা থেকে মিসরে সফর করেছিলেন। কেননা, তিনি শুনেছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আনীস আনসারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। সেমতে একমাস সামনে হেঁটে তিনি এ হাদীসটি শুনলেন। সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে আমাদের আমল পর্যন্ত এমন আলেম কমই হবেন, যাঁরা এলেম হাসিল করার জন্যে সফর করেননি।

আপন নফস ও চরিত্রের এলেমও জরুরী। কেননা, অভ্যাস সংশোধন ও চরিত্র গঠন ছাড়া আখেরাতের পথে চলা সম্ভবপর নয়। যে নিজের অন্তরের ভেদ ও গুণাগুণের অনিষ্ট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে না, সে অন্তরকে এগুলো থেকে পবিত্র করবে কিরূপে? সফর তাকেই বলে, যদ্দ্বারা চরিত্র প্রকাশ পায়। কারণ সফর শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রকাশ হওয়া। চরিত্র প্রকাশ পায় বলেই একে সফর বলা হয়েছে। তাই হযরত ওমর (রাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তি যখন কোন সাক্ষীর পরিচয় বর্ণনা করল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তার সাথে কোন দিন সফর করেছ? সে বলল ঃ না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তা হলে আমার জানামতে তুমি তার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নও। বিশর (রহঃ) বলতেন ঃ কারীগণ, সফর কর, যাতে পবিত্র হয়ে যাও। কারণ, পানি যখন প্রবাহিত হতে থাকে তখন পবিত্র হয়ে যায়। আর অনেক দিন এক জায়গায় স্থির থাকলে বদলে যায়। সারকথা, মানুষ যতদিন দেশে থাকে ততদিন অভ্যস্ত বিষয়সমূহের সাথেই পরিচিত থাকে; খারাপ চরিত্র প্রকাশ পায় না। কেননা, মনের বিরুদ্ধে কিছু করার সুযোগই হয় না। আর যখন সফরের কষ্টভোগ করে এবং অভ্যস্ত বিষয়সমূহের মধ্যে পরিবর্তন দেখে, তখন চরিত্রের গোপন বিষয়সমূহ উদঘাটিত হয়ে যায় এবং দোষ গুণ ধরা পড়ে। ফলে প্রতিকার করা সম্ভবপর হয়। এ ছাড়া সফরে আল্লাহ্ তা'আলার

নিদর্শনাবলী তথা পরস্পরে মিলিত বিভিন্ন স্থান, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, রকমারি জীবজন্তু ও উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলোর মধ্যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। কারণ, এদের প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদের সাক্ষ্য দান করে এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে। কিন্তু এই সাক্ষ্য ও তসবীহ সে-ই বুঝে, যে কান লাগায় এবং উপস্থিত অন্তর দিয়ে শুনে। নতুবা দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্যে বিমোহিত অবিশ্বাসী ও গাফেলরা এগুলো দেখেও না, শুনেও না। কারণ তেমন কান ও চোখ তাদের নেই। কোরআনের ভাষায় তাদের অবস্থা এই ঃ

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক অংশটা জানে। পরকাল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ বেখবর। আরও বলা হয়েছে- اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ তারা শ্রবণ থেকে বিচ্যুত। এখানে বাহ্যিক শ্রবণ উদ্দেশ্য নয়। কারণ বাহ্যিক শ্রবণ থেকে তারা বিচ্যুত ছিল না। বাহ্যিক শ্রবণ দ্বারা আওয়ায ছাড়া অন্য কিছু জানা যায় না। এক্ষেত্রে মানুষের কোন বিশেষত্ব নেই; বরং সকল জীবজন্তু আওয়ায শুনে। কিন্তু অন্তরের কান দ্বারা অবস্থার ভাষা শুনা যায়, যা মুখের ভাষা থেকে ভিন্ন। যেমন- কেউ বাবুই পাখী ও চড়াইয়ের কিস্সা বর্ণনা করে যে, বাবুই পাখীরে ডাকি বলিছে চড়ুই। কুঁড়েঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই। মোট কথা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কোন কণা নেই, যা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয় না। কিন্তু মানুষ কণার সাক্ষ্য ও তসবীহ্ বুঝে না। কেননা বাহ্যিক কানের সংকীর্ণ গহ্বর থেকে অন্তরের অনন্ত বিস্তৃত মাঠের দিকে সফর তাদের নসীব হয়নি। যদি প্রত্যেক অক্ষম ব্যক্তিই এ সফর করে নিত, তবে পক্ষীকুলের কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য হত না এবং হযরত মূসা (আঃ)-এরই খোদায়ী কালাম শ্রবণ করার বিশেষত থাকত না। যে ব্যক্তি পদার্থসমূহের পাতায় পাতায় খোদায়ী কলমে লিখিত সাক্ষ্যসমূহ অন্বেষণ করার নিয়তে সফর করে, তার দৈহিক সফর অনেক করতে হবে না; বরং সে এক জায়গায় অবস্থান করে আপন অন্তরকে সকল আবিলতা থেকে মুক্ত করবে, যাতে প্রতিটি কণার তসবীহ-ধ্বনি শুনে স্বস্তি পায়। এরূপ ব্যক্তির জঙ্গলে ঘোরাফেরা করার কি প্রয়োজন? তার উদ্দেশ্য তো রহস্যময় আকাশমণ্ডলী থেকে অর্জিত হতে পারে। কারণ, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সকলেই তার আজ্ঞাবহ। অতএব যে ব্যক্তির আশেপাশে স্বয়ং কা'বা তওয়াফ করে, সে

যদি কোন মসজিদের তওয়াফের জন্যে শ্রম স্বীকার করে, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি?

দ্বিতীয় প্রকার- এবাদতের জন্যে সফর করা; যেমন হজ্জ ও জেহাদের জন্যে সফর করা। হজ্জের রহস্য অধ্যায়ে আমরা এর ফযীলত, আদব এবং যাহেরী বাতেনী আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেছি। পয়গম্বর, সাহাবী, তাবেয়ী, আলেম ও ওলীগণের কবর যিয়ারতের জন্যে সফরও এর মধ্যে দাখিল। যাঁদেরকে জীবদ্দশায় দেখা বরকতের কারণ, মৃত্যুর পর তাঁদের কবর যিয়ারত করাও তেমনি বরকতের কারণ। এজন্যে সফর করা জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدُ اَلْحَرَامُ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا وَمَسْجِدُ الْاَقْصٰى -

অর্থাৎ, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দিকে সফর করবে না- মসজিদে হারাম, আমার এ মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।

এ হাদীসটি আমাদের বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কেননা, এটা মসজিদসমূহের বিধান। অর্থাৎ এ তিনটি মসজিদ একই পর্যায়ের। নতুবা এটা জানা কথা যে, পয়গম্বর ও ওলীগণের কবর যিয়ারতের মূল ফযীলতেও পার্থক্য হয়। স্থানের যিয়ারত করার কোন মানে নেই। কাজেই উপরোক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থান যিয়ারত করার জন্যে সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর ফযীলতও অনেক। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছেন এবং পাঁচটি নামায সেখানে আদায় করে পরের দিন সেখান থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন- ইলাহী, যে ব্যক্তি এ মসজিদে আগমন করে এবং নামায ছাড়া অন্য কিছু তার উদ্দেশ্য না থাকে, সে যতক্ষণ মসজিদে থাকে, ততক্ষণ তুমি তোমার রহমতের দৃষ্টি তার উপর থেকে সরিয়ে নিয়ো না। তাকে গোনাহ থেকে এমন পবিত্র করে দিয়ো যেমন সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন ছিল। আল্লাহ তা'আলা এই দোয়া কবুল করে নেন।

তৃতীয় প্রকার- ধর্মকর্ম ব্যাহত হওয়ার কারণে সফর করা। এ সফরও ভাল- কেননা, অসহনীয় বিষয় থেকে পশ্চাদসরণ করা নবী-রসূলগণের সুন্নত। যেসব বিষয় থেকে পলায়ন করা ওয়াজিব, সেগুলোর মধ্যে শাসনক্ষমতা, জাঁকজমক ও জাগতিক সম্পর্কের আধিক্য

অন্যতম। কেননা, এসব বিষয় অন্তরের একাগ্রতা বরবাদ করে দেয়। অন্তর যে পরিমাণে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে অবসর পাবে, সেই পরিমাণে ধর্মকর্মে মশগুল হওয়া সম্ভবপর হবে। জাগতিক কাজ-কারবার ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি থেকে অন্তরের অবসর পাওয়া তো সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক, প্রয়োজনাদি হালকা হোক কিংবা ভারী, যার প্রয়োজনাদি হালকা সে মুক্তি পাবে এবং যার ভারী, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলার শোকর, তিনি মুক্তিকে এ বিষয়ের সাথে জড়িত করেননি যে, সকল গোনাহ্ ও বোঝা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে; বরং তিনি আপন অসীম কৃপায় যাদের বোঝা হালকা, তাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন। হালকা বোঝা তার, যার প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতা বেশীর ভাগ দুনিয়ার দিকে নয়। বিস্তৃত জাঁকজমক ও অধিক সম্পর্কের কারণে স্বদেশে এটা সম্ভব নয়। কেননা, সফর করা, অখ্যাত হওয়া এবং যথাসম্ভব সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া সুদীর্ঘকাল পর্যন্তও অন্তর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারবে না। এরপর আশ্চর্য নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন এবং মনে শক্তি ও অন্তরে প্রশান্তি দান করবেন। ফলে তার কাছে সফর ও দেশে থাকা উভয়টি সমান হয়ে যাবে। তখন আল্লাহর যিকির থেকে কোন কিছু তাকে বাধা দিতে পারবে না, কিন্তু এরূপ হওয়া খুবই বিরল। এখন তো অন্তরের উপর দুর্বলতাই প্রবল। এতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার একত্রে স্থান সংকুলান খুব কমই হয়। হাঁ, এ শক্তিতে পয়গম্বর ও ওলীগণ বলীয়ান হয়ে থাকেন। প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ পর্যন্ত পৌঁছা সুকঠিন; তবুও পরিশ্রম ত্যাগ করা উচিত নয়। প্রচেষ্টারও এতে অল্পবিস্তর দখল আছে। এ ক্ষেত্রে অন্তরগত শক্তির বিভিন্নতা এমন, যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাহ্যিক শক্তি বিভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কতক সবল সুঠাম পাহলোয়ান ব্যক্তি একাই আড়াই মণ বোঝা বহন করতে পারে। যদি কোন দুর্বল রুগ্ন ব্যক্তি বোঝা বহনের অনুশীলন করে, সে-ও পাহলোয়ানের স্তরে পৌঁছে যাবে, তবে এটা কখনও হবার নয়। হাঁ, পারদর্শিতা ও প্রচেষ্টার ফলে তার শক্তি কিছুটা বেড়ে যাবে। সুতরাং উচ্চস্তরে পৌঁছার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পরিশ্রম বর্জন করা উচিত নয়। এটা নেহায়েত মূর্খতা ও চরম পথভ্রষ্টতা। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ফেতনার ভয়ে স্বদেশ ছেড়ে দিতেন। সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ এ সময়টা এত খারাপ যে, এতে অজ্ঞাতদেরও শান্তিতে থাকার উপায় নেই– খ্যাতিনামাদের তো কথাই নেই। এ সময় এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যাওয়া উচিত। আবু নয়ীম বলেন ঃ আমি সুফিয়ান সওরীকে দেখলাম, খাদ্যের থলে কোমরে বেঁধে এবং হাতে মাটির পাত্র

নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি এক গ্রামে সুলভে দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়। সেখানেই অবস্থান করতে চাই। তোমরাও এরূপ শুনলে তাই করো। তোমাদের দ্বীনদারী নিরাপদ থাকবে। বস্তুতঃ এ সফরটি ছিল দুর্মূল্যের কারণে। ইবরাহীম খাওয়াস এক শহরে চল্লিশ দিনের বেশী অবস্থান করতেন না।

চতুর্থ প্রকার– দেহের ক্ষতি করে এমন বস্তু থেকে সফর করা; যেমন প্লেগ, মহামারী ইত্যাদি। প্লেগ ছাড়া এ ধরনের অন্যান্য কারণে সফর করায় কোন ক্ষতি নেই; বরং সফরের উপকারিতা যদি ওয়াজিব হয়, তবে সফরও ওয়াজিব হবে এবং মোস্তাহাব হলে সফরও মোস্তাহাব হবে। প্লেগ থেকে পলায়ন করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। ওসামা ইবনে যায়দের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ هٰذَا الْوَجَعَ اَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ فِي الْاَرْضِ فَيَذْهَبُ .. مَرَّةً وَيَاْتِي اُخْرٰى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ فِي الْاَرْضِ فَلَا يَقْدَمْ مَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعَ بِاَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلَا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ -

অর্থাৎ, এ রোগটি একটি আযাব। তোমাদের পূর্ববর্তী এক উম্মতকে এই আযাব দেয়া হয়েছিল। এরপর এটা পৃথিবীতেই থেকে যায় এবং একবার চলে যায় ও একবার আসে। কেউ যদি কোন দেশে এ রোগের কথা শুনে, তবে সে যেন সেখানে না যায়। আর তুমি যেখানে থাক, সেখানে এই রোগ দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করো না।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মত "তা'ন" (ঠাট্টা বিদ্রূপ) ও "তা'উন" (প্লেগ) দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আমি আরজ করলাম ঃ "তা'ন"-এর অর্থ তো আমরা জানি; কিন্তু "তা'উন" কি? তিনি বললেন ঃ তা'উন হচ্ছে উটের স্ফীতির মত একটি স্ফীতি, যা মানুষের পিঠের নীচে ও নরম অংশে দেখা দেয়। এতে যে মুসলমান মারা যায় এবং যে সওয়াবের আশায় তা'উনের জায়গায় অবস্থান করে, সে যেন জেহাদের অপেক্ষায় বসে থাকে। আর যে পলায়ন করে, সে যেন জেহাদের সারি থেকে পলায়ন করে। এসব হাদীস থেকে জানা যায়, প্লেগ থেকে পলায়ন করা নিষিদ্ধ এবং প্লেগের মধ্যে যাওয়াও নিষিদ্ধ। এর রহস্য চতুর্থ খণ্ডে তাওয়াক্কুল অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

সারকথা, সফর মন্দ, ভাল অথবা মোবাহ্ হবে। মন্দ সফর হয় হারাম হবে; যেমন গোলামের পলায়ন করা অথবা পিতামাতার অবাধ্য হয়ে সফর করা। না হয় মকরূহ হবে; যেমন যে শহরে প্লেগ থাকে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া। ভাল সফরও হয় ওয়াজিব হবে; যেমন হজ্জের সফর এবং ফরয এলেমের অন্বেষণে সফর। না হয় মোস্তাহাব হবে; যেমন আলেম ও মাশায়েখের যিয়ারত করার জন্যে সফর। সকল প্রকার সফরে নিয়ত আখেরাতই থাকা উচিত। ওয়াজিব ও মোস্তাহাব সফরে এরূপ নিয়ত থাকতে পারে; কিন্তু হারাম ও মকরূহ সফরে অসম্ভব। মোবাহ্ সফর নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সফরের উদ্দেশ্য যদি মাল অন্বেষণ হয়, যাতে সওয়াল করতে না হয়, পরিবার-পরিজনের কাছে সম্ভ্রম বজায় থাকে এবং অতিরিক্ত মাল সদকা করা যায়, তবে নিয়তের কারণে এই মোবাহ্ সফর আখেরাতের আমল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি রিয়া ও খ্যাতির নিয়তে হজ্জের সফরে যায়, তবে এই নিয়তের কারণে সফরটি আখেরাতের আমল হবে না। কেননা, হাদীসে আছে- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ –আমল নিয়তের উপরই নির্ভরশীল। এটা ওয়াজিব, মোস্তাহাব ও মোবাহ্ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য– নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, নিয়তের প্রভাবে কোন নিষিদ্ধ বিষয় সিদ্ধ হয়ে যায় না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সফরকারী ব্যক্তির উপর কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত করে দেন। তারা তার উদ্দেশ্য দেখে এবং প্রত্যেককে তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রতিফল দান করা হয়। যার উদ্দেশ্য দুনিয়া থাকে, তাকে দুনিয়া দেয়া হয় এবং তার আখেরাত থেকে কয়েক গুণ হ্রাস করে দেয়া হয়। তার প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যার উদ্দেশ্য থাকে আখেরাত, তাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করা হয় এবং তার প্রচেষ্টা সুসংহত করা হয়। ফেরেশতারা তার জন্যে দোয়া ও এস্তেগফার করে।

নিম্নে সফরের কয়েকটি আদব বর্ণনা করা হচ্ছে-

(১) সফরের ইচ্ছা করার সময় পূর্বে কারও কোন হক আত্মসাৎ করে থাকলে তা তাকে সমর্পণ করবে, ঋণ শোধ করবে, পোষ্যবর্গকে খরচ দেয়ার কথা ভাববে এবং আমানত থাকলে তা মালিকের হাতে পৌঁছে দেবে। পাথেয় এই পরিমাণে বেশী নেবে, যাতে প্রয়োজনে সফরসঙ্গীদেরকে দেয়ার অবকাশ থাকে। সফরে ভাল কথাবার্তা বলা, সফরসঙ্গীদেরকে খাওয়ানো এবং উত্তম চরিত্র প্রকাশ করা নেহায়েত জরুরী। কেননা, সফর অন্তরের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ করে।

(২) সফরের জন্যে সঙ্গী বেছে নেবে। একাকী সফর করবে না। ধর্মকর্মে সহায়তা করতে পারে, এমন সঙ্গী হওয়া উচিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একাকী সফর করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ সফরে তিন জন হয়ে গেলে একজনকে দলনেতা করে নাও। আগেকার যুগের বুযুর্গগণ তাই করতেন। তাঁরা দলের নেতাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিযুক্ত করা নেতা বলতেন। এমন ব্যক্তিকে নেতা করতে হবে, যার চরিত্র সর্বাধিক ভাল এবং যে সঙ্গীদের প্রতি অধিক দয়ালু। নেতার প্রয়োজন এ জন্যে যে, গন্তব্যস্থল, পথ ও সফরের উপযোগিতা নির্ধারণের ব্যাপারে নানাজনের নানামত হয়ে থাকে। যদি একজনের মতের উপর নির্ভর করা হয়, তবে ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকবে। নতুবা কথায় বলে– "অধিক বামুনে যজ্ঞ নষ্ট।" এরপর নেতার কর্তব্য হবে সঙ্গীদের মঙ্গল চিন্তা করা এবং নিজেকে তাদের জন্যে ঢালে পরিণত করা; যেমন বর্ণিত আছে, একবার আবদুল্লাহ্ মরুযী সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে আবু আলী রেবাতী তাঁর সঙ্গী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন ঃ এই শর্তে মঞ্জুর যে, হয় তুমি নেতা হবে, না হয় আমি নেতা হব। আবু আলী বললেন ঃ নেতা আপনিই হবেন। এর পর আবদুল্লাহ্ মরুযী সমগ্র সফরে নিজের এবং আবু আলীর পাথেয় আপন কাঁধে বহন করলেন। এক রাতে বৃষ্টি শুরু হলে তিনি সমস্ত রাত্রি সঙ্গীর মাথার উপর চাদর ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন, যাতে সে বৃষ্টির পানিতে ভিজে না যায়। আবু আলী তাকে বাধা দিলে তিনি বলতেন ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। তুমি আমাকে নেতা মেনে নিয়েছ। এখন আমি যা চাইব তাই করব। তোমার কর্তব্য আমার আনুগত্য করা। আবু আলী মনে মনে বলতেন ঃ কি কুক্ষণে আমি তাঁকে শাসক ও নেতা বলে মেনে নিয়েছি। এর চেয়ে তো আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল। তিনি আমার জন্যে এত কষ্ট করে যাচ্ছেন!

(৩) রওয়ানা হওয়ার সময় পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নেবে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত এই দোয়া করবে-

استودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك -

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমানত রাখছি তোমার দ্বীনদারী, ঘড়বাড়ী এবং তোমার শেষ আমল।

বর্ণনাকারী তাবেয়ী বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত সফরে ছিলাম। আমি যখন তাঁর কাছ থেকে আলাদা হতে চাইলাম, তখন তিনি কয়েক পা আমার সাথে চললেন এবং বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লোকমানের এই উক্তি

বর্ণনা করতে শুনেছি– আল্লাহ্ তা'আলাকে কোন বস্তু সোপর্দ করা হলে তিনি তার হেফাযত করেন। আমি আল্লাহ্‌কে তোমার ধর্মকর্ম, ঘরবাড়ী ও শেষ আমল সোপর্দ করছি। যায়দ ইবনে কাইয়েমের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সফর করতে চায়, তখন সে পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নেবে। কারণ, তাদের দোয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বরকত দেবেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কাউকে বিদায় দিতেন, তখন এই দোয়া পাঠ করতেন ঃ

زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث توجهت .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দিন, তোমার গোনাহ্ মাফ করুন এবং যেখানেই তুমি যাও, তোমাকে কল্যাণমুখী করুন।

এ দোয়াটি সফরকারীর জন্যে তারা করবে, যারা তাকে বিদায় দিবে। মূসা ইবনে ওয়ারদান বলেন ঃ আমি এক সফরের ইচ্ছা করে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি বিষয় শেখাচ্ছি, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বিদায় হওয়ার জন্যে শিখিয়েছিলেন। তুমি এই দোয়া কর–

استودعت الله الذى لايضيع ودائعه

অর্থাৎ, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করছি। তাঁর হাতে যা সোপর্দ করা হয়, তা তিনি বিনষ্ট করেন না।

(৪) সফরের পূর্বে এস্তেখারার নামায পড়বে, যার নিয়ম আমরা নামায অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সফরের চার রাকআত নামায পড়ে নেবে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল, আমি একটি সফরের মান্নত করেছি। একটি ওসিয়ত লেখে রেখেছি। এখন সফরে যাওয়ার পূর্বে ওসিয়তটি কার কাছে সোপর্দ করব– পিতার কাছে, পুত্রের কাছে, না ভাইয়ের কাছে? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গৃহে রেখে যাওয়ার জন্যে এর চেয়ে উত্তম কোন কিছু নেই যে, রওয়ানা হওয়ার সময় গৃহে চার রাকআত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা ও সূরা এখলাস পড়বে, অতঃপর এই দোয়া পড়বে ঃ

اللهم انى اتقرب بهن اليك فاخلفنى بهن فى اهلى ومالى

–ইলাহী, আমি এই রাকআতগুলো দিয়ে তোমার নৈকট্য কামনা

করছি। অতএব এগুলোকে আমার নায়েব করে দাও আমার পরিবার পরিজন ও অর্থসম্পদের মধ্যে।

ফলস্বরূপ এই চার রাকআত নামায সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার গৃহের রক্ষক হয়ে যাবে।

(৫) গৃহের দরজায় পৌঁছে এই দোয়া করবে ঃ

بسم الله توكلت على الله لاحول ولا قوة الا بالله رب اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل واظلم او اظلم او اجهل او اجهل على

–আল্লাহ্‌র নামে বের হচ্ছি। আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছি। আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া গোনাহ্ থেকে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি নেই। পরওয়ারদেগার, আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে ও অপরকে পথভ্রষ্ট করা থেকে, নিজে বিচ্যুত হওয়া থেকে ও অপরকে বিচ্যুত করা থেকে, নিজে জুলুম করা থেকে ও মজলুম হওয়া থেকে এবং নিজে মূর্খতা করা থেকে ও আমার সাথে কারও মূর্খতা করা থেকে।

(৬) কোন মনযিলে অবস্থানের পর সেখান থেকে খুব ভোরে রওয়ানা দেবে। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) বৃহস্পতিবার দিন তাবুকের উদ্দেশে খুব ভোরে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং এই দোয়া করেছিলেন– اللهم بارك لامتى فى بكورها

অর্থাৎ, ইলাহী, আমার উম্মতকে তার ভোরবেলার চলায় বরকত দাও।

বৃহস্পতিবার দিন সফর শুরু করা মোস্তাহাব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন লশকর প্রেরণ করতেন, তখন প্রত্যূষে প্রেরণ করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কারও কাছে তোমাদের কোন কাজ থাকলে প্রত্যূষে যেয়ে তা করে নাও। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– ইলাহী, আমার উম্মতকে প্রত্যূষে গাত্রোত্থানে বরকত দাও। জুমুআর দিন ফজরের পরে সফর না করা উচিত। নতুবা জুমুআ তরকের গোনাহ্ হবে। কেননা, জুমুআর দিনের প্রথম অংশও জুমুআ ওয়াজিব হওয়ার একটি কারণ।

(৭) সূর্য খুব উত্তপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মনযিলে অবস্থান নেবে না। এটা সুন্নত। অধিকাংশ পথ রাতের বেলায় অতিক্রম করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ রাতের আঁধারে চল। কেননা, রাতে যে পরিমাণ দূরত্ব

অতিক্রম করা যায়, দিনে তা পারা যায় না। পথিমধ্যে উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করার সময় বলবে-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ۔

ইলাহী, সকল উচ্চের উপরে তুমি উচ্চ এবং তোমারই প্রশংসা সর্বাবস্থায়।

উচ্চভূমি থেকে নিম্নে অবতরণ করার সময় "সোবহানাল্লাহ্" বলবে।

(৮) দিনের বেলায় কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকবে এবং রাতে নিদ্রাকালে হুঁশিয়ার থাকবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে রাতের শুরুতে নিদ্রা গেলে হাত বিছিয়ে নিতেন এবং রাতে নিদ্রা গেলে হাত কিছুটা খাড়া রাখতেন, অতঃপর হাতের তালুতে মস্তক রাখতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল গভীর-নিদ্রা না আসা। এমন যেন না হয় যে, নিদ্রিত অবস্থায় সূর্যোদয় হয়ে যায়, ফলে নামায কাযা হয়। রাতের বেলায় সকল সঙ্গী মিলে পালাক্রমে প্রহরা দেয়ার ব্যবস্থা করা মোস্তাহাব।

(৯) সওয়ার হয়ে সফর করলে সওয়ারীর উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপাবে না এবং তার মুখে প্রহার করবে না। সওয়ারীর পিঠে নিদ্রা যাবে না। কেননা, নিদ্রাবস্থায় মানুষ ভারী হয়ে যায়। ফলে জন্তুর কষ্ট হয়। পরহেযগার ব্যক্তিগণ একটু ঝিমিয়ে নেয়া ছাড়া জন্তুর উপর কখনও নিদ্রা যেতেন না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা সওয়ারীর পিঠকে চৌকি বানিয়ে নিয়ো না। সকাল-সন্ধ্যায় সওয়ারী থেকে নেমে তাকে কিছু আরাম দেয়া মোস্তাহাব।

(১০) সফরে ছয়টি বস্তু সাথে নেয়া উচিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে পাঁচটি বস্তু সঙ্গে নিতেন- আয়না, সুরমাদানী, মেসওয়াক, চিরুনি ও কেঁচি। এক রেওয়ায়েতে ছয়টি বস্তুর উল্লেখ আছে ঃ অর্থাৎ, আয়না, শিশি, কেঁচি, মেসওয়াক, সুরমাদানী ও চিরুনি।

(১১) সফর থেকে ফিরে আসার আদব- রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ, ওমরা অথবা অন্য কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন প্রত্যেক যমীনে তিন বার আল্লাহু আকবর বলতেন এবং এই দোয়া করতেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ۔

আপন বস্তি দৃষ্টিগোচর হলে এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَّرِزْقًا حَسَنًا অর্থাৎ, হে আল্লাহ, এই বস্তিতে আমাকে স্থিতিশীলতা ও উত্তম রিযিক দান কর।

এরপর কাউকে আগমনের বার্তা দিয়ে গৃহে প্রেরণ করবে, যাতে অকস্মাৎ গৃহে উপস্থিত হয়ে খারাপ কিছু দেখতে না হয়। রাতের বেলায় গৃহে না পৌঁছা উচিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়তেন, এরপর গৃহে প্রবেশ করতেন। সফর থেকে ফেরার সময় পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যে কিছু উপঢৌকন আনা সুন্নত। কেননা, সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর দিকে সকলেই তাকিয়ে থাকে এবং উপঢৌকন পেয়ে আনন্দিত হয়। সফরে তাদের কথা স্মরণ করা হয়েছে, একথা ভেবে তাদের আনন্দ আরও বেড়ে যায়।

এ পর্যন্ত সফরের বাহ্যিক আদবসমূহ বর্ণিত হল। এখন এর আভ্যন্তরীণ আদব সংক্ষেপে লেখা হচ্ছে।

সফর তখনই অবলম্বন করবে, যখন সফরে ধর্মকর্ম বেশী হয়। ধর্মকর্মের প্রতি মনে বিরূপভাব লক্ষ্য করলে সেখানেই থেমে যাবে এবং ফিরে আসবে। মন যেখানে চায়, সেখানে মনযিল করবে। এর খেলাফ করবে না। কোন শহরে প্রবেশ করার সময় সেখানকার কামেল ব্যক্তিগণের যিয়ারত করার নিয়ত করবে। কোন শহরে এক সপ্তাহ অথবা দশ দিনের বেশী অবস্থান করবে না। হাঁ, যে কামেল ব্যক্তির কাছে যাও, তিনি যদি বেশী অবস্থান করতে বলেন তবে কোন দোষ নেই। যতদিনই অবস্থান কর, সত্য ফকীর ব্যতীত কারও কাছে বসবে না। যদি কোন ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাও, তবে তিন দিনের বেশী থাকবে না। এটাই আতিথেয়তার সীমা। কিন্তু ভাইয়ের কাছে বিচ্ছেদ কষ্টকর হলে বেশী থাকতে দোষ নেই। কোন শায়খের যিয়ারত করতে গেলে তার কাছে একদিন ও রাতের বেশী অবস্থান করবে না। নিজেকে আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল করবে না। এতে সফরের বরকত বিনষ্ট হয়ে যাবে। শহরে প্রবেশ করেই অন্য কিছুতে ব্যাপৃত না হয়ে সোজা শায়খের গৃহে চলে যাবে। শায়খ গৃহে থাকলে দরজায় খট্ খট্ শব্দ করবে না এবং ভিতরে যাওয়ারও অনুমতি চাইবে না; বরং তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। শায়খ বাইরে আগমন করলে আদব সহকারে তাঁর

সামনে গিয়ে সালাম করবে এবং কিছু বলবে না। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলে যতটুকু জিজ্ঞেস করেন, ততটুকুরই জওয়াব দেবে। অনুমতি না নিয়ে শায়খকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করবে না। সফরে থাকাকালে শহরের খাদ্য ও কষ্টের কথা বেশী আলোচনা করবে না এবং বন্ধুদের নাম বেশী নেবে না; বরং শায়খ ও ফকীরগণের আলোচনা করবে। সফরে বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবর যিয়ারত বর্জন করবে না; বরং প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে এরূপ কবর তালাশ করবে। সফরে তেলাওয়াত ও যিকির এমনভাবে করবে, যাতে অন্যে না শুনে। কেউ কথা বলতে এলে যিকির মুলতবী রেখে কথা বলবে। এরপর পূর্ববৎ যিকির করবে। যদি সফর অথবা গৃহে অবস্থান থেকে মন ঘাবড়ে যায়, তবে এর বিরোধিতা করা উচিত। কারণ, নফসের বিরোধিতায় বরকত আছে। যদি সাধু পুরুষগণের খেদমত নসীব হয়ে যায়, তবে তাঁদের খেদমতে অতিষ্ঠ হয়ে সফর করা উচিত নয়। কেননা, এটা নেয়ামতের নাশোকরী। যদি নিজের মধ্যে গৃহে অবস্থানের তুলনায় সফরে ক্ষতি অনুভূত হয়, তবে জেনে নেবে যে, সফর ভাল নয়। এমতাবস্থায় গৃহে ফিরে আসবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সফরের রুখসতসমূহের বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, সফরের শুরুতে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে কিছু পাথেয় সঙ্গে নেয়ার প্রয়োজন হয়। দুনিয়ার পাথেয় হচ্ছে খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম। যদি কাফেলার সাথে সফর করা হয় অথবা পথিমধ্যে স্থানে স্থানে জনপদ থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করে পাথেয় ছাড়া বের হলেও কোন ক্ষতি নেই। পক্ষান্তরে একাকী সফর করলে কিংবা যাদের কাছে খাদ্য ও পানীয় নেই তাদের সাথে সফর করলে এবং পথিমধ্যে জনপদ না থাকলে পাথেয় ছাড়া সফর করা জায়েয নয়। যদি সফরকারী ব্যক্তি এমতাবস্থায় সপ্তাহ কিংবা আট-দশ দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকার ক্ষমতা রাখে, তবে পাথেয় ছাড়া সফর করা জায়েয হবে। আর যদি এরূপ ক্ষুধা সহ্য করার ক্ষমতা না থাকে, তবে পাথেয় ছাড়া সফর করা গোনাহ্। কারণ, এটা নিজেই নিজেকে ধ্বংস করার শামিল। আসবাবপত্র সম্পূর্ণ বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল নয়।

আখেরাতের পাথেয় হচ্ছে এলেম তথা শিক্ষা, যার প্রয়োজন ওযু, নামায, রোযা ইত্যাদি এবাদতের মধ্যে হয়ে থাকে। সফরকারী ব্যক্তি এ পাথেয়ও অবশ্যই সঙ্গে নেবে। কেননা, সফর কতক বিধানকে সহজ করে দেয়; যেমন নামায কসর (হ্রাস) করা, রোযা না রাখা ইত্যাদি। কাজেই কতটুকু সহজ করে এবং কখন সহজ করে, এসব বিষয় জানা থাকা দরকার। সফরে কতক বিধান কঠিনও হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বাড়ীতে থাকাকালে মোটেই থাকে না, যেমন কেবলার অবস্থা জানা এবং নামাযের সঠিক সময় নিরূপণ করা। বাড়ীতে থাকাকালে মসজিদ দেখেই কেবলা এবং মুয়াযযিনের আযান শুনে নামাযের সময় জানা যায়, কিন্তু সফরে এসব বিষয় কখনও নিজে জেনে নেয়া আবশ্যক হয়।

নিম্নে সফরে প্রাপ্ত রুখসত (সহজকৃত বিষয়সমূহ) বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) সফরে মোজার উপর মসেহ্ করা– সফওয়ান ইবনে আসসাল (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে মুসাফির অবস্থায় তিন দিবারাত্র পর্যন্ত পা থেকে মোজা না খুলতে বলেছেন। এ থেকে জানা গেল, পূর্ণ ওযু করার পর যে ব্যক্তি মোজা পরিধান করে, সে ওযু ভেঙ্গে যাওয়ার সময় থেকে তিন দিবারাত্র পর্যন্ত প্রত্যেক ওযুর মধ্যে মোজার উপর মসেহ করতে পারে। গৃহে অবস্থানকারী হলে এই মাসেহ্ এক

দিবারাত্র পর্যন্ত জায়েয। পাঁচটি শর্তে মোজার উপর মাসেহ্ করা জায়েয। এক, পূর্ণ অযুর উপর মোজা পরিধান করতে হবে। সুতরাং কেউ যদি ডান পা ধৌত করার পর ডান পায়ে মোজা পরিধান করে, অতঃপর বাম পা ধুয়ে বাম পায়ে মোজা পরিধান করে, তবে অসমাপ্ত ওযুর উপর মোজা পরিধান করার কারণে তার জন্যে মোজার উপর মসেহ্ করা জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত ডান পায়ের মোজা খুলে আবার পরিধান না করে। দুই, মোজা এমন মজবুত হতে হবে, যা পায়ে দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করা যায়। কারণ, মোজা পরিধান করে মনযিলের পর মনযিল চলে যাওয়াই অভ্যাস। তিন, যে পর্যন্ত পা ধৌত করা ফরয, ততটুকু জায়গায় যেন মোজা ছিন্ন না থাকে। ছিন্ন থাকলে ফরয খুলে যাওয়ার কারণে মসেহ্ দুরস্ত হবে না। চার, মোজা পরিধান করার পর তা খুলবে না। খুললে নতুনভাবে ওযু করে পরিধান করতে হবে। কেবল উভয় পা ধুয়ে নিলেও যথেষ্ট হবে। পাঁচ, ধৌত করার জায়গার ঠিক উপরে মসেহ্ করতে হবে। সুতরাং পায়ের গোছার উপর মসেহ্ করলে দুরস্ত হবে না। মসেহ্ করার সর্বনিম্নস্তর হচ্ছে পায়ের পিঠের মোজার উপর ভিজা হাত বুলিয়ে দেবে। এমনভাবে বুলাবে, যাকে মসেহ্ বলা যায়। তিন অঙ্গুলি দিয়ে মসেহ্ করলে কারও মতভেদ বাকী থাকে না। পূর্ণাঙ্গ মসেহ্ হচ্ছে মোজার উপরে এবং নীচে একবার মসেহ্ করা– দু'বার নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাই করেছেন। মসেহ্ করার পদ্ধতি হচ্ছে, উভয় হাত ভিজিয়ে ডান হাতের অঙ্গুলিসমূহের মাথা ডান পায়ের অঙ্গুলিগুলোর উপর রেখে নীচের দিকে আস্তে আস্তে টেনে আনবে। এমনিভাবে বাম হাতের অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ বাম মোজার গোড়ালির নীচে রেখে পায়ের অঙ্গুলি পর্যন্ত পৌঁছাবে। যদি একামত (গৃহে থাকা) অবস্থায় মসেহ্ করে, এর পর মুসাফির হয়ে যায়, অথবা মুসাফির অবস্থায় মসেহ্ করার পর মুকীম হয়ে যায়, তবে উভয় অবস্থায় মুকীমের বিধান প্রবল থাকবে। অর্থাৎ এক দিবারাত্র পর্যন্ত মসেহ্ চলবে। মোজা পরিধান করার পর বেওযু হওয়ার সময় থেকে দিবারাত্রির হিসাব করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি কেউ গৃহে বাসকালে সকালে মোজা পরিধান করে, এরপর মসেহ্ করার পূর্বেই সফরে বের হয় এবং সূর্য ঢলে পড়ার সময় বে-ওযু হয়, তবে তিন দিবারাত্রি গণনা সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে করবে। অর্থাৎ চতুর্থ দিন সূর্য ঢলে পড়লে পা ধৌত করা ব্যতীত নামায পড়া জায়েয হবে না। যদি গৃহে অবস্থানকালে মোজা পরিধান করে এবং বেঅযু হয়, এরপর সফর শুরু করে, তবুও তিন দিবারাত্র পর্যন্ত মসেহ্ করবে। কিন্তু গৃহে থাকাকালে যদি মসেহ্ করে নেয়, এর পর সফর শুরু করে, তবে কেবল এক দিবারাত্র পর্যন্তই মসেহ্ করবে। যে ব্যক্তি গৃহে কিংবা সফরে মোজা পরিধান করতে চায়, তার জন্যে সর্প, বিচ্ছু, কাঁটা ইত্যাদির আশংকায়

মোজা ঝেড়ে নেয়া মোস্তাহাব। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর মোজা-জোড়া আনিয়ে একটি মোজা পরিধান করলেন। একটি কাক এসে অপর মোজাটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল এবং একটু দূরে নিক্ষেপ করল। তখন মোজার ভিতর থেকে একটি সর্প বের হল। এতে রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা এবং কেয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন মোজা না ঝেড়ে পরিধান না করে।

(২) তায়াম্মুম করা। পানি পাওয়া সুকঠিন হলে মাটি পানির বিকল্প। সুকঠিন হওয়ার অর্থ, পানি এতটুকু দূরে, যেখানে গেলে চিৎকার করলে কাফেলা পর্যন্ত আওয়ায পৌঁছে না। ফলে কেউ সাহায্যের জন্যে যেতে পারে না। কাফেলা থেকে এতটুকু দূরে কোন মুসাফির প্রস্রাব-পায়খানা করতে সাধারণতঃ যায় না। পানির কাছে কোন দুশমন অথবা হিংস্র প্রাণী থাকলেও পানি পাওয়া সুকঠিন হয়। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয। পান করার প্রয়োজনে পানি থাকলে এবং সঙ্গে অন্য কোন পানি না থাকলেও তায়াম্মুম করা দুরস্ত। যদি সঙ্গীদের মধ্য থেকে কারও পানি পান করার প্রয়োজন হয়, তবে সেই পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয নয়; বরং মূল্যের বিনিময়ে অথবা বিনা মূল্যে সেই পানি সঙ্গীকে দেয়া অপরিহার্য। যদি শুরবা পাকানো অথবা রুটি ভেজানোর জন্যে পানির প্রয়োজন থাকে, তবে তায়াম্মুম করা দুরস্ত হবে না। এমতাবস্থায় শুরবা পাকাবে না, রুটি ভেজাবে না; বরং ওযু করবে। অন্য কেউ পানি দান দান করলে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব, কিন্তু পানির মূল্য দান করতে হলে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। পানি স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হলে তা ক্রয় করা ওয়াজিব এবং বেশী মূল্যে বিক্রয় হলে ক্রয় করা ওয়াজিব নয়; ববং তায়াম্মুম করা জায়েয। পানির অভাবে যদি কেউ তায়াম্মুম করার ইচ্ছা করে, তবে প্রথমে পানি তালাশ করবে। মনযিলের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে দেখবে, নিজের আসবাবপত্র ও ঘটিবাটি খুঁজে দেখবে। যদি আসবাবপত্রে রাখা পানির কথা ভুলে যায় অথবা কাছেই কূপ ছিল, কিন্তু তালাশ করেনি, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়, তবে পুনরায় নামায পড়া অপরিহার্য হবে। যদি জানা যায়, শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়া যাবে, তবে প্রথম ওয়াক্তে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়া উত্তম। কেননা, জীবনের ভরসা নেই এবং প্রথম ওয়াক্তে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি থাকে। তাই এটা অগ্রগণ্য।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) একবার সফরে তায়াম্মুম করলেন। লোকেরা আরজ করল ঃ আপনি তায়াম্মুম করলেন, অথচ মদীনার দালানকোঠা অদূরেই দেখা যাচ্ছে? তিনি বললেন ঃ আমি সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত জীবিত থাকব কি? নামায শুরু করার পর পানি পাওয়া গেলে

নামায বাতিল হবে না এবং ওযু করাও জরুরী হবে না। তবে নামায শুরু করার পূর্বে পানি পাওয়া গেলে ওযু করতে হবে। তালাশ করার পর পানি না পাওয়া গেলে ধুলা মিশ্রিত মাটিতে দু'হাতের অঙ্গুলি বন্ধ করে একবার মারবে এবং উভয় হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মসেহ্ করবে। এর পর উভয় হাতের অঙ্গুলি ছড়িয়ে দ্বিতীয় বার মারবে এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মসেহ্ করবে। যদি একবারে সকল জায়গায় ধুলা না পৌঁছে, তবে আরও একবার হাত মাটিতে মেরে নেবে। তায়াম্মুম দ্বারা এক ফরয পড়ার পর যত ইচ্ছা নফল পড়া যায়। অন্য ওয়াক্তের ফরয পড়তে চাইলে পুনরায় তায়াম্মুম করতে হবে। (এ মাসআলাটি শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ী লিখিত।) নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করা যাবে না। যদি এই পরিমাণ পানি পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা কতক অঙ্গ ধৌত করা যায়, তবে কতক অঙ্গে পানি ব্যবহার করে পূর্ণ তায়াম্মুম করে নেবে।

(৩) সফরের তৃতীয় রুখসত ফরয নামাযে কসর করা। মুসাফির ব্যক্তি যোহর, আসর ও এশার নামাযে চার রাকআতের স্থলে দু'রাকআত পড়বে। যদি মুসাফির মুকীম ইমামের এক্তেদা করে, তবে চার রাকআতই পড়বে।

(৪) সওয়ারীর উপর নফল নামায পড়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে সাওয়ারীর উপর নফল পড়তেন– সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন। এ ক্ষেত্রে সওয়ারীর কেবলামুখী হওয়া জরুরী নয়। যেব্যক্তি সওয়ারীর উপর নফল পড়বে, সে ইশারায় রুকু-সেজদা করবে। সেজদার জন্যে রুকু অপেক্ষা অধিক নত হবে।

(৫) পদব্রজে চলা অবস্থায় সফরে নফল পড়া দুরস্ত। এমতাবস্থায় রুকু ও সেজদার জন্যে ইশারা করবে এবং তাশাহহুদের জন্যে বসবে না। কেননা, বসতে হলে রুখসতের ফায়দা কি? তবে পদব্রজে চলন্ত ব্যক্তি নফল পড়লে কেবলামুখী হয়ে তকবীরে তাহরীমা করে নেবে। কারণ, এক মুহূর্তের জন্যে রাস্তা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু সওয়ার ব্যক্তির জন্যে সওয়ারীর মুখ ফেরানো অসুবিধাজনক। পথিমধ্যে নাপাকী থাকলে ইচ্ছাকৃতভাবে তা মাড়াবে না। মাড়ালে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সওয়ার ব্যক্তির সওয়ারীর পায়ের নীচে নাপাকী পড়লে নামায নষ্ট হবে না।

(৬) মুসাফির ব্যক্তির জন্যে সফরে রোযা না রাখা জায়েয। কিন্তু সকালে গৃহে থাকলে এর পর সফর শুরু করলে সেদিনের রোযা রাখা অপরিহার্য হবে। রোযাদার মুসাফির দিন শেষ হওয়ার পূর্বে গৃহে এসে গেলে সেই রোযা পূর্ণ করা অপরিহার্য নয়। ইচ্ছা করলে রোযা ছেড়ে দিতে পারে। মুসাফিরের জন্যে রোযা না রাখার চেয়ে রাখা উত্তম। কিন্তু রোযা ক্ষতির কারণ হলে না রাখাই উত্তম।

অষ্টম অধ্যায়

সেমা ও তার আদব

প্রকাশ থাকে যে, লোহা ও পাথরের মধ্যে যেমন অগ্নি লুক্কায়িত এবং পানির নীচে মাটি আত্মগোপন করে থাকে, তেমনি অন্তরের মধ্যে আন্তরিক উৎকর্ষ ও রহস্যসমূহ লুক্কায়িত আছে। এগুলো বিকশিত করার জন্যে রাগ তথা সঙ্গীতের সুর অপেক্ষা উত্তম কোন উপায় নেই। কর্ণ ছাড়া অন্তরে যাওয়ার অন্য কোন পথ নেই। ভারসাম্যপূর্ণ ও সুমধুর সঙ্গীতলহরী অন্তরের আভ্যন্তরীণ ভালমন্দ রহস্যসমূহ ফুটিয়ে তোলে। কেননা, অন্তর ভর্তি পাত্রসদৃশ। একে উপুড় করলে তাই বের হবে, যা দ্বারা তা ভর্তি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সঙ্গীতের সুরও অন্তরের জন্যে সত্যিকার কষ্টিপাথর। সঙ্গীত দ্বারা যখন অন্তর আন্দোলিত হবে, তখন তাই প্রকাশ পাবে, যা অন্তরের উপর প্রবল। অন্তর স্বভাবগতভাবে সঙ্গীতের অনুগত। এমনকি, এর কারণে সে তার ভালমন্দ সবকিছু প্রকাশ করে দেয়। তাই "সেমা" (ধর্মসঙ্গীত) ও তা থেকে সৃষ্ট "ওয়াজদ" (উন্মত্ততা ও মূর্ছা) সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা করা অত্যাবশ্যক। এতদুভয়ের উপকারিতা, বিপদাপদ এবং আকার-আকৃতিও ব্যাখ্যা করা জরুরী। এ সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল একে নিষিদ্ধ ও একদল বৈধ বলেন। আমরা নিম্নে দু'টি পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সঙ্গীতের বৈধতা সম্পর্কে মতভেদ

প্রথমে সঙ্গীত হয় এবং তা থেকে অন্তরে একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে "ওয়াজদ" বলা হয়। ওয়াজদের কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আন্দোলিত হয়। এ আন্দোলন ভারসাম্যপূর্ণ না হলে "ইযতিরাব" (চাঞ্চল্য) বলা হয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ হলে এর নাম হয় "তাল ও নাচ।" আমরা প্রথমে সঙ্গীতের বিধান লিপিবদ্ধ করব এবং এ সম্পর্কিত মতভেদসমূহ উদ্ধৃত করব। এর পর সঙ্গীতের বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সবশেষে যারা একে হারাম বলে, তাদের প্রমাণসমূহের জওয়াব উল্লেখ করব।

কাযী আবু তাইয়েব তাবারী ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আযম আবু হানীফা, সুফিয়ান সওরী ও আরও অনেক আলেমের এমন সব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা জানা যায়, তাঁরা সকলেই সঙ্গীত হারাম বলতেন। ইমাম শাফেয়ী "কিতাবুল কাযা" গ্রন্থে বলেন ঃ গান বাতিল

বিষয়সমূহের ন্যায় একটি মন্দ ক্রীড়া। যে অধিক গান করে, সে বেওকুফ। তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। ইমাম শাফেয়ীর শিষ্যবর্গের মতে, যে মহিলা মাহরাম নয়, তার কাছ থেকে সঙ্গীত শ্রবণ করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়– সে প্রকাশ্যে থাকুক কিংবা পর্দার অন্তরালে, মুক্ত হোক কিংবা বাঁদী। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ বাঁদীর মালিক যদি বাঁদীর গান শুনার জন্যে লোকজনকে একত্রিত করে, তবে তাকে নীচ বলা হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা সুর-তান বাজানোকে খারাপ মনে করতেন এবং একে খোদাদ্রোহীদের আবিষ্কার আখ্যা দিতেন। কোরআন থেকে গাফেল করাই ছিল এ আবিষ্কারের উদ্দেশ্য। ইমাম শাফেয়ী আরও বলেন ঃ "নরদ" (দাবার মত এক প্রকার ক্রীড়া) খেলা অন্যান্য খেলার তুলনায় অধিক মকরূহ। কেননা, এর অপকৃষ্টতা হাদীস দ্বারা জানা যায়। আমি "শতরঞ্জ" তথা দাবা খেলা পছন্দ করি না এবং অন্য যেসব খেলা রয়েছে, সবগুলো আমি মকরূহ মনে করি। কেননা, খেলা ধার্মিক ব্যক্তিদের কাজ নয়। ইমাম মালেক সঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছেন এবং ফতোয়া দিয়েছেন, কোন বাঁদী ক্রয় করার পর যদি জানা যায় যে, সে গায়িকা, তবে তাকে ফেরত দেয়া ক্রেতার জন্যে জায়েয। মদীনাবাসী সকল আলেমের মাযহাবও তাই– একা এক ব্যক্তি ইবরাহীম ইবনে সা'দ ছাড়া। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) সকল ক্রীড়া-কৌতুক খারাপ মনে করতেন এবং সঙ্গীত শুনতে নিষেধ করতেন। সুফিয়ান সওরী, হাম্মাদ, ইবরাহীম, শাবী প্রমুখ কুফাবাসী সকল আলেমের অবস্থাও তাই।

আবু তালেব মক্কী (রহঃ) অনেক আলেমের তরফ থেকে সঙ্গীতের বৈধতা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর, ইবনে যোবায়র, মুগীরা ইবনে শো'বা, মোয়াবিয়া (রাঃ) প্রমুখ সঙ্গীত শুনেছেন, অনেক তাবেয়ী এবং বুযুর্গগণও শ্রবণ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, আমাদের মতে মক্কার মধ্যে সর্বদাই হেজাযীরা বছরের শ্রেষ্ঠ দিনসমূহে সঙ্গীত শ্রবণ করে এসেছেন; যেমন তাশরীকের দিনসমূহে। মক্কাবাসীর ন্যায় মদীনাবাসীরাও আমাদের এই সময়কাল পর্যন্ত সব সময় সঙ্গীত শ্রবণ করেছেন। আমরা আবু মারওয়ান কাযীকে দেখেছি, তাঁর কাছে কয়েকজন গায়িকা বাঁদী ছিল। তিনি সুফীদের জন্যে এদেরকে রেখেছিলেন। এরা তাঁদেরকে রাগ শুনাত। হযরত আতার কাছে দু'টি গায়িকা বাঁদী ছিল, যারা তাঁর বন্ধুদেরকে সঙ্গীত শুনাত। আবু তালেব মক্কী আরও বলেন ঃ আবুল হাসান

ইবনে সাম (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি কিরূপে সঙ্গীত অস্বীকার করেন, অথচ হযরত জুনায়দ, সিররী সকতী ও যুন্নুন মিসরী (রহঃ) সঙ্গীত শুনতেন? তিনি বললেন ঃ আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যখন একে জায়েয বলেছেন এবং শ্রবণ করেছেন, তখন আমি একে স্বীকার করব না কেন? সেমতে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তাইয়ার শ্রবণ করতেন এবং বলতেন, আমি তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক স্বীকার করি না। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন ঃ তিনটি বিষয় আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছে– এক, সুশ্রী হওয়া নিরাপত্তাসহ; দুই, উত্তম কথাবার্তা ধর্মপরায়ণতাসহ এবং তিন, বন্ধুত্ব হৃদ্যতাসহ। আমি কোন কোন কিতাবে হুবহু এ উক্তি হারেস মুহাসেবী থেকে বর্ণিত দেখেছি। হারেস মুহাসেবী সংসারবিমুখ এবং ধর্মকর্মের হেফাযতে অত্যন্ত অধ্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও রাগ ও সঙ্গীত বৈধ জ্ঞান করতেন। ইবনে মুজাহিদের রীতি ছিল, তিনি দাওয়াত তখনই কবুল করতেন, যখন তাতে সঙ্গীতও থাকত। যেসকল আউলিয়া সঙ্গীত শুনে অজ্ঞান হয়ে যেতেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আবুল খায়ের আসকালানী। তিনি সেমা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এতে সঙ্গীত বিরোধীদের খণ্ডন করেছেন। আরও অনেকে বিরোধীদের উক্তিসমূহ খণ্ডন করে গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি খিযির (আঃ)-কে দেখে আরজ করলাম, সঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের আলেমগণ মতভেদ করেন, সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ এটা নির্মল ও স্বচ্ছ। আলেমগণের পদ ব্যতীত এতে অন্য অন্য কারো পদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। মমশাদ দিনূরী বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম, সঙ্গীতকে আপনি খারাপ মনে করেন কি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমি একে খারাপ মনে করি না, কিন্তু তাদেরকে বলে দিয়ো তারা যেন এর আগে কোরআন পাঠ করে এবং কোরআন পাঠ করেই খতম করে। তাহের ইবনে বেলাল হামদানী ওয়াররাক আলেমগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি জেদ্দার জামে মসজিদে এ'তেকাফরত ছিলাম। একদিন একদল লোককে মসজিদের এক কোণে কিছু গাইতে দেখে মনে মনে খারাপ ভাবলাম এবং বিস্মিত হয়ে বললাম– আল্লাহ্র গৃহে কবিতা পাঠ করা হচ্ছে! সেদিনই রাত্রে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি মসজিদের সেই কোণে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর বরাবর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আছেন, যিনি কিছু কবিতা পাঠ করছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কবিতা শ্রবণ করে ওজদের অবস্থায় আপন বুকে হাত রাখছেন। আমি

মনে মনে বললাম– যারা কবিতা শ্রবণ করছিল, তাদেরকে খারাপ মনে করা ঠিক হয়নি। এখানে তো স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) শ্রবণ করছেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) শুনাচ্ছেন। রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এটা নিশ্চিত সত্য অথবা তিনি বললেন ঃ এটা অন্যতম সত্য। ঠিক কোন্ বাক্যটি বলেছিলেন তা আমার সঠিকভাবে স্মরণ নেই। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ দরবেশগণের প্রতি তিন জায়গায় রহমত অবতীর্ণ হয়– খাওয়ার সময়, কেননা উপবাস না করে তারা খায় না; পরস্পরে আলোচনা করার সময়, কেননা সিদ্দীকগণের মকাম ছাড়া তারা অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করে না এবং সঙ্গীত শ্রবণ করার সময়; কারণ তারা উন্মত্ততা সহকারে সঙ্গীত শ্রবণ করে এবং হকের সম্মুখে থাকে। ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সঙ্গীত শ্রবণ করার অনুমতি দিতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ কেয়ামতের দিন সঙ্গীত আপনার নেকীর পাল্লায় থাকবে, না বদীর পাল্লায়? তিনি বললেন ঃ কোন পাল্লায়ই থাকবে না। এটা সেই لَغْوٌ তথা বাজে বিষয়ের অনুরূপ, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىٓ اَيْمَانِكُمْ বাজে বিষয়ের কসম খাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধরপাকড় করবেন না।

মোট কথা, সঙ্গীত সম্পর্কে উপরোক্তরূপ উক্তিসমূহ বর্ণিত আছে। অনুসরণের ক্ষেত্রে সত্যান্বেষী ব্যক্তি এসব উক্তিকে পরস্পর বিরোধী পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে কিংবা যেদিকে মনের ঝোঁক দেখে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। এটা ঠিক নয়; বরং সত্যকে সত্যরূপে অন্বেষণ করা উচিত; অর্থাৎ, এতে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ অথবা বৈধ জানা যায়, সেগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করা দরকার, যাতে পরিণামে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে যায়। আমরা নিম্নে তাই করছি।

সঙ্গীত বৈধ হওয়ার প্রমাণ ঃ জানা উচিত, সঙ্গীত হারাম বলার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এ কারণে শাস্তি দেবেন। এটা নিছক বিবেকবুদ্ধি দিয়ে জানার বিষয় নয়; বরং এর জন্যে কোরআন-হাদীসের প্রমাণ আবশ্যক। বলাবাহুল্য, শরীয়তের বিষয়সমূহ জানা দু'টি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ– এক, নস্ এবং দুই, কিয়াস, যা নস সম্পর্কিত বিষয়ের উপর করা হয়। নস্ সেই বিষয়কে বলা হয়, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন উক্তি অথবা কর্ম দ্বারা প্রকাশ করেছেন এবং কিয়াস সেই বিষয়কে বলা হয়, যা তাঁর ভাষা ও কর্মদৃষ্টে বুঝা যায়। সুতরাং যদি কোন বিষয়ে নস্ না থাকে এবং কিয়াসও কল্পনা না করা যায়, তবে সে বিষয়কে হারাম বলা বাতিল।

বরং সে বিষয়টি অন্যান্য বৈধ বিষয়ের মত গণ্য হবে। সঙ্গীতের বেলায় আমরা তাই দেখি। এর নিষিদ্ধতার পক্ষে না আছে কোন নস্, না আছে কোন কিয়াস; বরং নস্ ও কিয়াস উভয়টি সঙ্গীত বৈধ হওয়ার কথা জ্ঞাপন করে। কিয়াস এভাবে জ্ঞাপন করে যে, সঙ্গীতের মধ্যে কয়েকটি বিষয় একত্রিত আছে। প্রথমে এসব বিষয় আলাদা আলাদা দেখে অবশেষে সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

সুতরাং প্রথমে দেখা দরকার সঙ্গীত কি? বলাবাহুল্য, সঙ্গীত হচ্ছে এমন সুললিত ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বর শ্রবণ করা, যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। এ সংজ্ঞায় ব্যাপক বিষয় হচ্ছে সুললিত স্বর। এটাও দু'প্রকার– ভারসাম্যপূর্ণ স্বর এবং ভারসাম্যপূর্ণ নয়, এমন স্বর। ভারসাম্যপূর্ণ স্বরও দু'প্রকার– এক, যার অর্থ বুঝা যায়; যেমন কবিতা এবং দুই, যার অর্থ বুঝা যায় না; যেমন জীবজন্তুর স্বর। সুললিত স্বর শ্রবণ করা শ্রুতিমধুর হওয়ার কারণে এমন বিষয় নয় যে, হারাম হবে। বরং এটা নস্ ও কিয়াসদৃষ্টে হালাল। কিয়াস হচ্ছে, এর পরিণতি হল শ্রবণেন্দ্রিয় একটি বিশেষ বস্তু দ্বারা পুলক অনুভব করে। মানুষের একটি বিবেক শক্তি ও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের একটি উপলব্ধি আছে। যেসকল বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয়, তন্মধ্যে কতক ইন্দ্রিয়ের কাছে ভাল লাগে এবং কতক খারাপ লাগে। উদাহরণতঃ দৃষ্টিশক্তি সবুজ বনানী, প্রবাহিত পানি, সুশ্রী মুখমণ্ডল সকল সুন্দর রং দেখে আনন্দ অনুভব করে এবং ময়লাযুক্ত রং, কুশ্রী চেহারা ইত্যাদি খারাপ মনে করে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় সকল প্রকার সুগন্ধি ভালবাসে এবং দুর্গন্ধকে ঘৃণা করে। আস্বাদন ইন্দ্রিয় সুস্বাদু ও চর্বিযুক্ত খাদ্য পছন্দ করে এবং তিক্ত ও বিস্বাদ বস্তু অপছন্দ করে। বিবেক শক্তি জ্ঞান ও মারেফত দ্বারা আনন্দিত হয় এবং মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা দ্বারা ব্যথিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যেসকল বস্তু উপলব্ধ হয়, সেগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। কতক শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে ভাল লাগে; যেমন কোকিলের কুহু কুহু স্বর, উত্তম বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায ইত্যাদি এবং কতক খারাপ লাগে; যেমন গাধার চেঁচামেচি। এই ইন্দ্রিয়ের আনন্দানুভূতিকে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আনন্দাভূতির উপর কিয়াস করে বৈধ বলা অযৌক্তিক নয়। অনুরূপভাবে নস্ দ্বারাও জানা যায় যে, সুললিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা বৈধ। কেননা, আল্লাহ তাআলা মানুষকে প্রদত্ত মধুর কণ্ঠস্বর তাঁর একটি অনুগ্রহরূপে প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন ঃ وَيَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ –তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। কথিত আছে, এর অর্থ সুমধুর কণ্ঠস্বর।

হাদীসে আছে–

مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ –আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর সুমধুর ছিল।

এক হাদীসে বলা হয়েছে– যেব্যক্তি সুললিত স্বরে কোরআন পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার তেলাওয়াত সেই প্রভুর তুলনায় অধিক শ্রবণ করেন, যে তার বাঁদীর সঙ্গীত শ্রবণ করে। এক হাদীসে হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রশংসায় এরশাদ হয়েছে– তিনি সুললিত স্বরে যবুর তেলাওয়াত করতেন। এমনকি, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনার জন্যে মানুষ, জ্বিন, বন্য পশু এবং পক্ষীকুল পর্যন্ত সমবেত হয়ে যেত। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরীর প্রশংসায় বলেন ঃ

لَقَدْ اُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ –আবূ মূসাকে দাঊদ বংশের এক সুললিত কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন–

اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ –সর্বাধিক শ্রুতিকটু শব্দ হচ্ছে গাধার শব্দ।

এ উক্তি সুললিত স্বরের প্রশংসা জ্ঞাপন করে। যদি কেউ বলে যে, সুললিত স্বর এই শর্তে বৈধ যে, তা কোরআন তেলাওয়াতে হবে, তবে তাকে একথাও অবশ্যই বলতে হবে, বুলবুলির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা হারাম। কেননা, এটাও কোরআন তেলাওয়াত নয়। বুলবুলির কণ্ঠস্বর শুনা যদি দুরস্ত হয়, তবে যে কণ্ঠস্বরে প্রজ্ঞা ও বিশুদ্ধ অর্থ পাওয়া যায়, তা শ্রবণ করা নাজায়েয হবে কেন? বলাবাহুল্য, কতক কবিতা আদ্যোপান্ত প্রজ্ঞা হয়ে থাকে। সুললিত স্বর সম্পর্কে এই আলোচনা করা হল। এখন সুললিত স্বরের সাথে ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। কেননা, ভারসাম্য এক বিষয় এবং সুললিত হওয়া ভিন্ন বিষয়। প্রায়ই স্বর ভাল হয়, কিন্তু ভারসাম্য থাকে না। কখনও ভারসাম্য থাকে, কিন্তু স্বর ভাল হয় না। উৎপত্তিস্থলের দিক দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ স্বর তিন প্রকার। এক, যা জড় পদার্থ থেকে নির্গত হয়; যেমন বাঁশীর স্বর, তারের ঝংকার, কাষ্ঠের সুরতান এবং ঢোলকের শব্দ। দুই, যা মানুষের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়। তিন, যা প্রাণীকুলের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়; যেমন বুলবুলি, ঘুঘু ও অন্যান্য সুকণ্ঠী পক্ষীর আওয়ায। এই প্রকার আওয়ায যেমন সুললিত হয়, তেমনি ভারসাম্যপূর্ণও হয়। এর সূচনা ও পরিণতিতে তালমিল থাকে। ফলে শুনতে ভাল লাগে। সারকথা, সুললিত ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার কারণে

এসব স্বর শ্রবণ করা হারাম হতে পারে না। কেননা, কারও মাযহাব এরূপ নয় যে, বুলবুলির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা হারাম। এটা হতে পারে না, এক পাখীর কণ্ঠস্বর হারাম হবে এবং অন্যটির হবে না। জড় পদার্থ এবং প্রাণীর মধ্যেও এরূপ কোন তফাৎ নেই যে, প্রাণীর স্বর দুরস্ত হবে এবং জড় পদার্থের স্বর দুরস্ত হবে না। অতএব, যে স্বর মানুষের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয় অথবা কাষ্ঠ থেকে বের করা হয় অথবা ঢোলক কিংবা দফ বাজানোর ফলে সৃষ্ট হয়, সবগুলো বুলবুলির কণ্ঠস্বরের সাথে কিয়াস করে দুরস্ত হওয়া উচিত। তবে শরীয়ত যেগুলো নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলো এর ব্যতিক্রম; যেমন ক্রীড়াকৌতুকের সাজসরঞ্জাম এবং তারের বাদ্য। এগুলো হারাম হওয়ার কারণ আনন্দ পাওয়া নয়। কেননা, আনন্দ পাওয়ার কারণে এগুলো হারাম হলে আনন্দ পাওয়ার সকল বস্তুই মানুষের জন্যে হারাম হয়ে যেত। বরং এগুলো হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, মানুষের মদ্যপানের আসক্তি অত্যন্ত বেশী ছিল। তাই একে কঠোরভাবে হারাম করা হয় এবং শুরুতে মদের মটকা ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ করা হয়। এর সাথে সাথে যেসকল বস্তু মদ্যপায়ীদের অপরিহার্য নিদর্শন ছিল; যেমন বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি, সেগুলোও হারাম করা হয়। কেননা, এগুলো মদ্যপানের অনুগামী বস্তু। উদাহরণতঃ বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে একত্রিত হওয়া হারাম। কারণ, এটা ব্যভিচারের ভূমিকা। অথবা অল্প মদ নেশার কারণ না হলেও তা হারাম। কেননা, অল্প পানের অভ্যাস শেষ পর্যন্ত বেশী পানে বাধ্য করবে। মোট কথা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি হারাম হয়েছে মদের অনুগামী হওয়ার কারণে। কেননা, প্রথমতঃ এসব বস্তু মদ্যপানের দিকে আহ্বান করে। যে আনন্দ এগুলো দ্বারা অর্জিত হয়, তা মদ দ্বারাই ষোলকলায় পূর্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ যেব্যক্তি অল্প দিন হয় মদ ত্যাগ করেছে, এসব বাদ্যযন্ত্র দেখলে তার পূর্বের মদের মজলিস স্মরণ হয়ে যাবে। সুতরাং এগুলো স্মরণ হওয়ার কারণ হয়। স্মরণ হলে আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আগ্রহ অধিক হলে তা মদ্যপানের কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই মদ নিষিদ্ধ করার শুরুতে আরবে প্রচলিত চার প্রকারের বিশেষ মদ্যপাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এগুলো দেখলেই মদ স্মরণ হয়ে যেত। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি মদ্যপান সহকারে সঙ্গীত শ্রবণে অভ্যস্ত হয় এবং সঙ্গীত শুনলেই মদ মনে পড়ে যায়, তবে তাকে এ কারণেই সঙ্গীত শুনতে মানা করা হবে। তৃতীয়তঃ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সমাবেশ করা পাপাচারী ফাসেকদেরই অভ্যাস। এ মিলের কারণে এগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা, যেব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হয়। এ

কারণেই আমরা বলি, যদি কোন সুন্নতকে বেদআতীরা তাদের পরিচয় চিহ্ন করে নেয়, তবে তাদের সাথে মিলের আশংকায় সেই সুন্নতটি বর্জন করা জায়েয। অনুরূপভাবে ডুগডুগি বাজানো হারাম। কেননা, এটা বানরওয়ালা বাজায়। মোট কথা, উপরোক্ত তিনটি কারণে তারের বাদ্যযন্ত্র যেমন– বীণা, বেহালা, সারঙ্গী ইত্যাদি হারাম হয়েছে। এগুলো ছাড়া অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র যেমন ঢাকঢোল ইত্যাদি বৈধ। এগুলোকে পাখীদের আওয়াযের উপর কিয়াস করে বৈধ করা হয়েছে। কারণ, মদের সাথে এগুলোর সম্পর্ক নেই। মদ্যপায়ীরা এগুলো বাজায় না এবং এতে মদের মজলিস স্মরণ হয় না। এতে মদ্যপায়ীদের সাথে মিলও প্রকাশ পায় না।

ভারসাম্যপূর্ণ স্বরের এক প্রকার ছিল, যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়; যেমন কবিতা। এ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, কবিতা মানুষের কণ্ঠ থেকেই নির্গত হয়। তাই নিশ্চিতরূপে বৈধ। হাঁ, এক্ষেত্রে দেখতে হবে, কবিতার বিষয়বস্তু কিরূপ? যদি বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ ধরনের হয়, তবে এর গদ্য ও পদ্য উভয়ই হারাম এবং একে মুখে আবৃত্তি করাও হারাম, সঙ্গীত সহকারে আবৃত্তি হোক বা সঙ্গীত ব্যতিরেকে হোক। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ কবিতা এক প্রকার কালাম; ভাল হলে ভাল এবং খারাপ হলে খারাপ। কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছে এবং তিনি বলেছেন ঃ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً –কতক কবিতা সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা। তিনি কবি হাসসান ইবনে সাবেতের জন্যে মসজিদে একটি মিম্বর স্থাপন করাতেন, যাতে তিনি তার উপর দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কীর্তিগাথা বর্ণনা করেন এবং কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের জওয়াব দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে হাসসানকে শক্তি যোগান যে পর্যন্ত সে কাফেরদের জওয়াব দেয় এবং রসূলের গৌরবগাথা বর্ণনা করে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে কবিতা পাঠ করতেন এবং তিনি মুচকি হাসতেন। ওমর ইবনে শরীদের পিতা বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে উমাইয়া ইবনে আবুস্সলতের একশ' পংক্তি কবিতা আবৃত্তি করলাম। তিনি প্রত্যেকবার বলতেন ঃ আরও আবৃত্তি কর। কবিতার মধ্যে মনে হয় সে যেন মুসলমান। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, সফরে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্য 'হুদী' পাঠ করা হত। উটের পিছনে হুদী পাঠ করার প্রথা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের যমানায় সব সময় চালু ছিল। হুদী এক প্রকার কবিতাই, যা সুললিত স্বরে ও ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গীত সহকারে পাঠ করা হত। এতে উটের গতিবেগ বেড়ে যেত। সাহাবীগণের মধ্যে

কেউ এটা অপছন্দ করেছেন বলে বর্ণিত নেই; বরং মাঝে মাঝে তারা এটা করার অনুরোধ করতেন।

সঙ্গীত মনকে আন্দোলিত করে এবং মনের প্রবল ভাবকে উত্তোলিত করে। তাই আমরা বলি, আত্মার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গীতের সম্পর্ক রাখার বিষয়টি আল্লাহ তাআলার একটি ভেদ। ফলে সঙ্গীত আত্মার মধ্যে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণতঃ কতক সঙ্গীত দ্বারা প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয় এবং কতক সঙ্গীত দ্বারা বিষাদ ফুটে উঠে। কোন কোন সঙ্গীতে হাসির উদ্রেক হয়। কতক সঙ্গীতের প্রভাবে মানুষের হাত, পা, মস্তক ইত্যাদি অঙ্গ আন্দোলিত হতে থাকে। এখানে এরূপ ধারণা করা ঠিক নয় যে, এটা বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার কারণে হয়, তারের ঝংকারেও এরূপ হয়ে থাকে। কচি শিশুর মধ্যেও এ বিষয়টি পাওয়া যায়। যখনই তাকে সুললিত স্বরে ঘুম পাড়ানী গান শুনানো হয়, তখনই সে কান্না ছেড়ে চুপ হয়ে যায় এবং স্বরধ্বনি শুনতে থাকে। অথচ সে কোন অর্থ বুঝে না। অনুরূপভাবে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন উটও হুদী গানের এমন প্রভাব গ্রহণ করে যে, ভারী ভারী বোঝাও সে এর কারণে হালকা মনে করতে থাকে। স্ফূর্তির আতিশয্যে সে দূরবর্তী পথকে নিকটবর্তী মনে করে। বড় বড় বিজন প্রান্তরে উট যখন বোঝা ও হাওদার চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখনও হুদীর আওয়াজ শুনে মাথা তুলে তাকায় এবং হুদী গানে কান লাগিয়ে দ্রুতবেগে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে অধিক বোঝা ও দ্রুত চলার কারণে উট মরেও যায়, কিন্তু তখন হুদীর আনন্দে সে কিছুই টের পায় না।

আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ দীনূরী বর্ণনা করেন, একবার জঙ্গলে আরবের একটি গোত্রের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল– তাদের এক ব্যক্তি আমাকে দাওয়াত করে তাঁবুতে নিয়ে গেল। তাঁবুতে প্রবেশ করে আমি দেখলাম, এক গোলাম হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। দরজার সামনে কয়েকটি উট মরে পড়ে আছে। আর একটি মরেনি', কিন্তু মৃতপ্রায় গোলাম আমাকে বলল ঃ আপনি মেহমান। আপনার কর্তব্য আমার প্রভুর কাছে আমার জন্যে সুপারিশ করা। আমার প্রভু অত্যন্ত অতিথিবৎসল। তিনি এতটুকু বিষয়ের জন্যে আপনার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করবেন না। সম্ভবতঃ তিনি আমাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেবেন। অতঃপর মেযবান যখন আমার সামনে খাদ্য উপস্থিত করল, তখন আমি খেতে অস্বীকার করলাম এবং বললাম ঃ যে পর্যন্ত আপনি এই গোলামের ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল না করেন, আমি খাদ্য গ্রহণ করব না। মেযবান বলল ঃ এই গোলাম আমাকে ফতুর করে দিয়েছে এবং আমার সর্বস্ব বিনষ্ট

করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সে কি করেছে? মেযবান জওয়াব দিল ঃ এ কয়েকটি উটের ভাড়ার উপর আমার জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। সে এগুলোর পিঠে অতিমাত্রায় বোঝা চাপিয়েছে। তার কণ্ঠস্বর সুমধুর। সে যখন হুদীতে টান দিল, তখন উটগুলো তিন দিনের পথ একদিনে অতিক্রম করল। এর পর বোঝা নামানোর সাথে সাথে সবগুলো উট মারা গেল। কেবল একটি উট এখনও জীবিত আছে, যা সত্বরই মারা যাবে বলে মনে হয়, কিন্তু আপনি আমার মেহমান। মেহমানের খাতিরে এই গোলাম আপনাকে দান করলাম। এর পর গোলামের কণ্ঠস্বর শুনার জন্যে আমার ঔৎসুক্যের অন্ত রইল না। সকালে আমার মেযবান গোলামকে বলল ঃ হুদী পাঠ কর। তখন সে একটি কূপ থেকে পানি বহনকারী উট নিয়ে আসছিল। হুদী গানে টান দিতেই সেই উট এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল এবং রশি ছিঁড়ে ফেলল। আমিও উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। আমার মনে পড়ে না, জীবনে কখনও এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনেছি।

এ থেকে জানা গেল, সঙ্গীতের প্রভাব অন্তরে অনুভূত হয়। সঙ্গীত যার অন্তরকে নাড়া দেয় না, সে অসম্পূর্ণ, সমতাবিচ্যুত, আধ্যাত্মিকতা বর্জিত এবং মনের দিক দিয়ে উট, পশুপক্ষী এমনকি সকল চতুষ্পদ জন্তু থেকে অধিকতর স্থূল। কেননা, ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গীত সকলকেই কমবেশী দোলা দেয়। এ কারণেই হযরত দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর শুনার জন্যে পক্ষীকুল শূন্যমণ্ডলে স্থির হয়ে যেত। অন্তরে এই প্রভাব বিস্তারের দিকে লক্ষ্য করলে সঙ্গীতকে সর্বাবস্থায় বৈধ অথবা সর্বাবস্থায় হারাম বলা ঠিক হয় না; এটা অবস্থা, ব্যক্তি এবং সঙ্গীতের ধরনভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অন্তরের ভিতরকার ভাবের যে বিধান, সঙ্গীতের বিধানও তাই। আবু সোলায়মান বলেন ঃ সঙ্গীত অন্তরে সেই ভাব সৃষ্টি করে না, যা তার মধ্যে বিদ্যমান নেই; বরং মনের ভিতরে যে ভাব লুক্কায়িত থাকে, সঙ্গীত তাকেই আন্দোলিত করে থাকে। মোট কথা, বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সাত জায়গায় ভারসাম্যপূর্ণ ও ছন্দপূর্ণ বাক্যাবলী গাওয়ার নিয়ম আছে। প্রথম জায়গা হাজীদের গাওয়া। তারা কবিতায় ঢাকঢোল বাজায় এবং সঙ্গীত গেয়ে ফিরে। এটা বৈধ। কেননা, এসব কবিতায় কাবার প্রশংসা করা হয় এবং মকামে ইবরাহীম, যমযম, হাতীম ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের উল্লেখ করা হয়। এর প্রভাব হচ্ছে, পূর্ব থেকে হজ্জের আগ্রহ থাকলে এসব কবিতা শুনে আগ্রহ আরও বহুগুণে বেড়ে যায়। নতুবা আগ্রহ তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। হজ্জ পুণ্য কাজ বিধায় তার আগ্রহ ভাল। অতএব আগ্রহ সৃষ্টি করা তা যে-কোন উপায়ে হোক, ভালই হবে।

দ্বিতীয় জায়গা গাজীদের গান। তারাও মানুষকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে ছন্দময় কবিতা গায়। এটাও বৈধই; কিন্তু গাজীদের কবিতা এবং গাওয়ার নিয়ম হাজীদের থেকে ভিন্ন হওয়া দরকার। কেননা, জেহাদের আগ্রহ ও বীরত্বগাথা বর্ণনা, কাফেরদের প্রতি রোষ সৃষ্টি, জান ও মালকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বীরত্বের কবিতা পাঠ দ্বারাই হয়ে থাকে। জেহাদ বৈধ হলে এটা বৈধ এবং জেহাদ মোস্তাহাব হলে এটাও মোস্তাহাব, কিন্তু তাদের জন্যেই যাদের জেহাদে যাওয়া জায়েয।

তৃতীয় জায়গা মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় বীরদের গান। এই কাব্যগানের উদ্দেশ্য নিজেকে বীরত্ব প্রদর্শনে এবং সাহসিকতার সাথে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ায়, উদ্বুদ্ধ করা। এসব কাব্যে বাহাদুরী ও বিজয় ঘোষণা করা হয়। ভাষা উচ্চাঙ্গের এবং কণ্ঠস্বর ভাল হলে এর প্রভাব অধিক হয়ে থাকে। মল্লযুদ্ধে এ ধরনের কবিতা গাওয়া বৈধ এবং মোস্তাহাব। মল্লযুদ্ধে মোস্তাহাব, কিন্তু মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে নিষিদ্ধ। হযরত আলী ইবনে আবী তালেব, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ সায়ফুল্লাহ প্রমুখ বীর সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই কবিতা পাঠ বর্ণিত আছে।

চতুর্থ জায়গা কারও মৃত্যুর কারণে বিলাপ ও শোকগাথা গাওয়া। এর প্রভাব হচ্ছে বিষাদ ও উদাসভাব সৃষ্টি করা। বিষাদ দু'প্রকার ঃ একটি প্রশংসনীয় ও অপরটি নিন্দনীয়। কোন কিছু খোয়া যাওয়ার কারণে যে বিষাদ হয়, তা নিন্দনীয়। এ কারণে বিষাদ করতে আল্লাহ্ তাআলা নিষেধ করেছেন। বলা হয়েছে-

كَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ -যাতে তোমরা দুঃখ না কর তার জন্যে, যা ফওত হয়ে গেছে। মৃতের জন্যে দুঃখ করাও এর মধ্যে দাখিল। এতে আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তে যেন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের বিষাদ নিন্দনীয় বিধায় শোকগাথা দ্বারা একে উত্তোলিত করাও নিন্দনীয়। এ কারণেই বিলাপ ও শোকগাথা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রশংসনীয় বিষাদ হচ্ছে ধর্মকর্মে অক্ষমতা এবং পাপরাশি স্মরণ করে বিষাদ করা। এ জন্যে কান্নাকাটি করা এবং কান্নাকাটির ভান করা উত্তম। হযরত আদম (আঃ) এ জন্যেই কান্নাকাটি করতেন। এ বিষাদে ক্ষতিপূরণের প্রেরণা সৃষ্টি হয় বিধায় হযরত দাউদ (আঃ)-এর শোকগাথা প্রশংসনীয় ছিল। কেননা, অধিক কান্নাকাটি ও বিষাদ গোনাহের কারণে ছিল। সেমতে তিনি নিজে বিষণ্ন হতেন এবং অপরকেও বিষণ্ন করতেন, নিজে কাঁদতেন এবং অপরকেও কাঁদাতেন। তাঁর শোকগাথার মজলিস

থেকে জানাযা বের হত। তিনি এই বিলাপ ভাষা ও সুর সহকারে করতেন।

পঞ্চম জায়গা আনন্দোৎসব ও উল্লাস প্রকাশের জন্যে গাওয়া। যেমন ঈদের দিনে, বিবাহ মজলিসে, অনুপস্থিত ব্যক্তির আগমনে, ওলীমা, আকীকা, পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণে এবং খতনা ও হিফযে কোরআনে আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশে গাওয়া জায়েয। কেননা, কতক স্বরভঙ্গি দ্বারা আনন্দোচ্ছ্বাস উত্তোলিত হয়। অতএব যেসব ক্ষেত্রে আনন্দ-উল্লাস করা জায়েয, সেখানে আনন্দোচ্ছ্বাস উত্তোলন করাও জায়েয। যখন রসূলে আকরাম (সাঃ) মদীনা তাইয়েবাকে শুভ পদার্পণ দ্বারা গৌরবান্বিত করেন, তখন মহিলারা ছাদের উপর দফ বাজিয়ে গীত গাচ্ছিল–

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوِدَاعِ (ছানিয়াতুল বিদা গিরিপথ থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের উপর উদিত হয়েছে।) এটা তাঁর শুভাগমনের উল্লাস ছিল বিধায় এতে সুর, লাফালাফি ও অঙ্গভঙ্গি করাও প্রশংসনীয় ছিল। বর্ণিত আছে, কতক সাহাবী যখন উল্লসিত হতেন, তখন আনন্দের আতিশয্যে এক পায়ে ভর দিয়ে নাচানাচি করতেন। বোখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) কন্যা আয়েশার গৃহে গমন করলেন। তখন সেখানে মিনা দিবস উপলক্ষে দু'টি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল ও নৃত্য করছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বাঙ্গ চাদরে আবৃত করে শায়িত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বালিকাদ্বয়কে ধমক দিলে তিনি মুখমণ্ডলের উপর থেকে চাদর সরিয়ে বললেন ঃ আবু বকর, ছাড়, এদেরকে কিছু বলো না। জান না, এটা ঈদের দিন। হযরত আয়েশা (রাঃ) আরও বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে রেখেছিলেন আর আমি মসজিদে হাবশীদের ক্রীড়া-কৌতুক দেখছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) এসে আমাকে শাসালে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ হে বনী আরকাদা, তোমরা নির্বিঘ্নে খেলা প্রদর্শন কর। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার সখীরাও এতে যোগ দিত। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখলে লজ্জায় কক্ষে চলে যেত। তিনি আমার সাথে খেলার জন্যে তাদেরকে পাঠিয়ে দিতেন। এক হাদীসে আছে– নবী করীম (সাঃ) একদিন হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো কি? তিনি বললেন ঃ আমার পুতুল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এগুলোর মাঝখানে এটা কি? তিনি আরজ করলেন ঃ ঘোড়া। তিনি বললেন ঃ এই ঘোড়ার দুপাশে এগুলো কি? তিনি আরজ করলেন ঃ পাখা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)

বললেন, ঘোড়ার আবার পাখা হয় নাকি? হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন ঃ আপনি শুনেননি, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ঘোড়ার পাখা ছিল? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এ কথা শুনে রসূলে করীম (সাঃ) এত হাসলেন যে, তাঁর উভয় দন্তপাটি প্রকাশ হয়ে পড়ল।

আমাদের মতে পুতুলের হাদীসটি বালিকাদের অভ্যাস ধরতে হবে। তারা পূর্ণ অবয়ব ছাড়াই মাটি অথবা কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরী করে নেয়। কতক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, সেই ঘোড়ার দু'টি পাখা কাপড় দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল।

ষষ্ঠ জায়গা প্রেমিকদের রাগ। এর উদ্দেশ্য আগ্রহকে নাড়া দেয়া, এশক বৃদ্ধি পাওয়া এবং মনের স্থিরতা লাভ হয়ে থাকে। প্রেমাস্পদের সম্মুখে হলে এতে আনন্দ অধিক হয়। আর বিরহের স্থলে হলে উদ্দেশ্য আগ্রহকে উত্তোলিত করা হয়। এ ধরনের রাগও হালাল, যদি প্রেমাস্পদ এমন হয় যার মিলন বৈধ। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি তার বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে গেলে সে আনন্দ লাভের উদ্দেশে স্ত্রীর রাগ শ্রবণ করতে পারে।

সপ্তম জায়গা এমন লোকদের সঙ্গীত শ্রবণ করা, যারা আল্লাহ তাআলার এশকে বিভোর এবং তাঁর দীদারে আগ্রহী, তারা যেদিকে তাকায়, কেবল তাঁর নূর দেখতে পায় এবং যে স্বর শুনে, তা তাঁর কাছ থেকেই মনে করে। সেমা এরূপ লোকদের আগ্রহ উত্তোলিত করে এবং এশক ও মহব্বত পাকাপোক্ত করে। সেমা তাদের অন্তরে চকমকি পাথরের কাজ করে এবং এমন কাশফ লতীফা প্রকাশ প্রকাশ করে, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যে এর স্বাদ গ্রহণ করে সে-ই বুঝে। যার অনুভূতি এর স্বাদ গ্রহণে অক্ষম, সে এর মর্ম জানে না। সুফীগণের পরিভাষায় এ অবস্থার নাম "ওজুদ", যা "ওজদ" (পাওয়া) ধাতু থেকে নির্গত। অর্থাৎ, তারা মনের মধ্যে এমন অবস্থা পায়, যা সঙ্গীতের পূর্বে জানা থাকে না। এসব অবস্থার কারণে পরে এগুলোর অনুগামী এমন এমন বিষয় সৃষ্টি হয়, যা অন্তরকে আপন অনলে দগ্ধ করে এবং যাবতীয় মলিনতা থেকে এমন পরিষ্কার করে দেয়, যেমন আগুনে পুড়ে সোনা রূপা পরিষ্কার ও নির্মল হয়ে যায়। এর পর মোশাহাদা ও মোকাশাফা হয়, যা সকল খোদাপ্রেমিকের পরম ও চরম লক্ষ্য এবং যাবতীয় এবাদতের ফল।

সঙ্গীত হারাম হওয়ার কারণ ঃ পাঁচটি কারণে রাগ তথা সঙ্গীত হারাম হয়ে থাকে। প্রথম, গায়িকা এমন নারী হলে, যাকে দেখা হালাল নয় এবং যার গানে ফেতনার আশংকা থাকে। শ্মশ্রুবিহীন বালকের

বিধানও তাই। কারণ, তার গানেও ফেতনার আশংকা থাকে। দ্বিতীয়, এমন বাদ্যযন্ত্র সহকারে সঙ্গীত করলে, যা রাখা মদ্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্য; যেমন সেতার, বেহালা ইত্যাদি তারের বাদ্যযন্ত্র। এগুলো ছাড়া অন্যান্য যন্ত্র বৈধ; যেমন– দফ, কাষ্ঠনির্মিত বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। তৃতীয়, সঙ্গীতের বাণীতে ত্রুটি থাকলে; অর্থাৎ, অশ্লীল, বাজে, বিদ্রূপাত্মক এবং আল্লাহ্, রসূল ও সাহাবায়ে কেরামের শানে অসত্য বিষয়বস্তু সম্বলিত হলে সেই সঙ্গীত বৈধ নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের লোকেরা সাহাবায়ে কেরামের শানে এ ধরনের সঙ্গীত কবিতা রচনা করে থাকে। এ ধরনের কবিতা গীতরূপে এবং গীত ছাড়াও শ্রবণ করা হারাম। অনুরূপভাবে সেই কবিতাও হারাম, যাতে কোন বিশেষ মহিলার রূপলাবণ্য বর্ণনা করা হয়। কেননা, কোন নির্দিষ্ট মহিলার এমন আলোচনা পুরুষদের সামনে জায়েয নয়, যদ্দ্বারা তার দৈহিক অবস্থা ফুটে উঠে। তবে সাধারণভাবে নারী অঙ্গের চিত্র ও সৌন্দর্য কবিতায় বর্ণনা করা এবং তা গাওয়া হারাম নয়। শ্রোতার উচিত এ বর্ণনাকে কোন নির্দিষ্ট সুন্দরী নারীর জন্যে কল্পনা না করা। হাঁ, আপন বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে কল্পনা করায় দোষ নেই। কাফের ও বেদআতীদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক কবিতা গাওয়া জায়েয। সেমতে কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি বিদ্রূপ করে কবিতা আবৃত্তি করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে এর অনুমতি দান করেছিলেন। চতুর্থ, শ্রোতার মধ্যে অনিষ্ট থাকার কারণে সঙ্গীত হারাম হয়; যেমন কামভাব প্রবল থাকা এবং ভরা যৌবনে থাকা। এরূপ ব্যক্তির জন্যে সঙ্গীত শ্রবণ করা হারাম। তার অন্তরে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মহব্বত প্রবল হোক বা না হোক। কেননা, সে যখনই কেশগুচ্ছ, গাল এবং বিরহ ও মিলনের বর্ণনা শুনবে, তখনই তার কামভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং কল্পনায় কোন নির্দিষ্ট সুন্দরী নারী ভেসে উঠবে। ফলে তার কামানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। বলাবাহুল্য, অন্তরে শয়তান বাহিনী (অর্থাৎ, কামভাব) এবং আল্লাহ্র বাহিনী (অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধির নূর)– এ দু'য়ের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই আছে। তবে যার মধ্যে এক বাহিনী বিজয়ী হয়ে যায় এবং অপর বাহিনী সম্পূর্ণ পরাভূত হয়, তার ভিতরকার যুদ্ধ মওকুফ হয়ে যায়। আজকাল অধিকাংশ অন্তরকে শয়তান বাহিনী জিতে নিয়েছে। এমতাবস্থায় নতুনভাবে সমরাস্ত্র সংগ্রহ করা প্রয়োজন; যাতে অন্তর থেকে শয়তানের পা উপড়ে যায়। শয়তানের অস্ত্র বাড়ানো কিছুতেই উচিত নয়। এ ধরনের লোকের জন্যে সঙ্গীত শয়তান বাহিনীর অস্ত্র শাণিত করার শামিল। এরূপ ব্যক্তির সেমা'র মজলিস থেকে চলে যাওয়া

উচিত। নতুবা সঙ্গীত দ্বারা তার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হবে। সঙ্গীত হারাম হওয়ার পঞ্চম কারণ, শ্রোতার সাধারণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রবল নয় যে, সেমা তার কাছে ভাল মনে হবে এবং তার মধ্যে কামভাবও প্রবল নয় যে, সঙ্গীত তার জন্যে নিষিদ্ধ হবে। এরূপ লোকের জন্যে সেমা' অন্যান্য বৈধ আনন্দের মতই, কিন্তু সে যদি সেমাকে অভ্যাসে পরিণত করে নেয় এবং অধিকাংশ সময় এতেই ব্যয় করে, তবে সে নির্বোধ, যার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। কেননা, ক্রীড়াকৌতুক সব সময় করা গোনাহ্। সগীরা গোনাহ্ সব সময় করলে যেমন কবীরা গোনাহ্ হয়ে যায়, তেমনি বৈধ কাজ সব সময় করলে গোনাহ্ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ হাবশীদের পেছনে সব সময় পড়ে থাকা এবং তাদের খেলাধুলা দেখা নিষিদ্ধ, যদিও তা আসলে নিষিদ্ধ নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এটা দেখেছেন। এটা গালে তিল থাকার মত। তিল যদিও কাল, কিন্তু গালে একটি দু'টি থাকলে ভালই দেখায় আর অনেকগুলো থাকলে বিশ্রী হয়ে যায়। সুতরাং এটা ঠিক নয় যে, কোন বস্তু বৈধ হলে তার অধিক মাত্রাও বৈধ হবে এবং কোন কোন বস্তু আধিক্যের কারণে হারাম হয়ে যায়। অতএব, সেমাও মাঝে-মধ্যে হলে বৈধ এবং নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত হলে অবৈধ।

যারা হারাম বলে, তাদের দলীল ও জওয়াব ঃ প্রথম দলীল– আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ কতক লোক ক্রীড়ার কথাবার্তা ক্রয় করে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ), হাসান বসরী ও মখফী (রঃ) বলেন ঃ "ক্রীড়ার কথাবার্তা" মানে সঙ্গীত। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন গায়িকা বাঁদীকে, তার ক্রয় বিক্রয়, তার মজুরি এবং তার শিক্ষাকে। এর জওয়াব হল, এই হাদীসে সেই বাঁদীকে বুঝানো হয়েছে, যে মদের মজলিসে পুরুষদের সামনে গান গায়। এটা যে হারাম, তা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আরবরা গায়িকা বাঁদী দ্বারা নিষিদ্ধ গান গাওয়াত। যদি কেবল প্রভু নিজের সামনে গাওয়ায়, তবে এ হাদীস দ্বারা তার নিষিদ্ধতা বুঝা যায় না। আয়াতে যে ক্রীড়ার কথাবার্তা ক্রয় করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তারপরে এ কথাও বলা হয়েছে, যাতে এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে দেয়। এটা বাস্তবে হারাম। কিন্তু সকল গানই আল্লাহ তাআলার পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে নয়। আয়াতে এমন সঙ্গীতই উদ্দেশ্য, যা বিচ্যুত করার নিয়তেই হয়। এটা কেবল সঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কেউ যদি মানুষ পথভ্রষ্ট

হোক– এ নিয়তে কোরআনও পাঠ করে, তবে তাও হারাম হবে। সেমতে বর্ণিত আছে, জনৈক মোনাফেক নামাযে ইমামতি করত এবং সূরা আবাসা ছাড়া অন্য কোন সূরা তেলাওয়াত করত না। কারণ এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শাসানো হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এ কাজ হারাম মনে করে মোনাফেককে হত্যা করতে চাইলেন। কেননা, তার উদ্দেশ্য ছিল পথভ্রষ্ট করা। সুতরাং কবিতা ও গানের উদ্দেশ্য পথভ্রষ্ট করা হলে তা নিঃসন্দেহে হারাম হবে। দ্বিতীয় দলীল– আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَاتَبْكُوْنَ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ -

তোমরা কি এই বাণী দেখে বিস্মিত হও, হাস্য কর, ক্রন্দন কর না এবং খেলা তামাশা কর?

কথিত আছে, হেমইয়ারী ভাষায় "সমূদ" সঙ্গীতকে বলা হয়। এ থেকেই "সামিদূন" উদ্ভূত হয়েছে। এ আয়াতের জওয়াব হল, যদি আয়াতে উল্লিখিত হলেই হারাম হয়ে যায়, তবে হাস্য করা এবং ক্রন্দন করাও হারাম হওয়া দরকার। কেননা, এগুলোও আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। যদি বলা হয়, এখানে হাসির অর্থ বিশেষ হাসি; অর্থাৎ, মুসলমান হওয়ার কারণে মুসলমানের প্রতি বিদ্রূপের হাসি, তবে আমরাও বলব, সঙ্গীত দ্বারা বিশেষ সঙ্গীত উদ্দেশ্য, যা মুসলমানদের প্রতি উপহাস সম্পর্কিত। যেমন আল্লাহ্ বলেন– وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ (পথভ্রষ্টরাই কবিদের অনুসরণ করে।) এখানে কাফের কবি উদ্দেশ্য। এই অর্থ নয় যে, পদ্য রচনা করাই হারাম।

তৃতীয় দলীল– হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সর্বপ্রথম শয়তানই বিলাপ করেছে এবং সে-ই প্রথমে গান গেয়েছে। এতে সঙ্গীত ও বিলাপ একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এর জওয়াব হচ্ছে, বিলাপ হলেই তা হারাম হয় না; যেমন হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিলাপ এর ব্যতিক্রম ছিল এবং গোনাহের কারণে গোনাহগারের বিলাপও এর ব্যতিক্রম। এমনিভাবে যে সঙ্গীত দ্বারা বৈধ বিষয়ের প্রতি আনন্দ, বিষাদ ও আগ্রহ আন্দোলিত হয়, তাও ব্যতিক্রমভুক্ত; যেমন ঈদের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গৃহে বালিকাদের গান গাওয়া এবং মদীনায় শুভাগমনের দিন মহিলাদের গীত গাওয়া।

চতুর্থ দলীল– হযরত আবু উমামার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি সঙ্গীতে কণ্ঠ দেয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা

শয়তানকে তার স্কন্ধে প্রেরণ করেন। সে তার উভয় গোড়ালি দিয়ে গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত গায়কের বুকে আঘাত করতে থাকে। এর জওয়াব হচ্ছে, এই হাদীসে সঙ্গীতের কতক প্রকার বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, যে সঙ্গীত দ্বারা শয়তানের অভীষ্ট তথা কামভাব ও মানুষের প্রতি এশক উত্তেজিত হয়, কিন্তু যে সঙ্গীত দ্বারা আল্লাহ্র প্রতি ঔৎসুক্য অথবা ঈদের আনন্দ অথবা কোন মহান ব্যক্তির আগমনের উল্লাস বৃদ্ধি পায়, তা শয়তানের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বিধায় হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

পঞ্চম দলীল হচ্ছে, ওকবা ইবনে আমেরের রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ খেলাধুলার সকল বস্তু বাতিল, কিন্তু আপন ঘোড়াকে ঘুরানো-ফেরানো, তীর নিক্ষেপ করা এবং স্ত্রীর সাথে আনন্দ গীত গাওয়া– এগুলো বাতিল নয়। এর জওয়াব হচ্ছে, বাতিল বললেই হারাম বলা হয় না; বরং বাতিলের অর্থ অনর্থক স্বীকার করে নিলেও হাবশীদের খেলাধুলা দেখা এই তিনের মধ্যে দাখিল থেকে হারাম হবে না। যেমন এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

لَايَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلٰثٍ –তিনটি কারণের মধ্য থেকে যেকোন একটি কারণ ছাড়া মুসলমানকে হত্যা করা হালাল নয়) এখানে সীমিতের মধ্যে অসীমকে কেয়াস করে চতুর্থ এবং পঞ্চম কারণকেও সংযুক্ত করে নেয়া হয়।

ষষ্ঠ দলীল– হযরত ওসমান গনী (রাঃ) বলেন ঃ যখন থেকে আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বয়াত হয়েছি, কখনও গীত গাইনি, মিথ্যা বলিনি এবং ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিনি। এর জওয়াব হচ্ছে, এ উক্তি হারাম হওয়ার দলীল হলে ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করাও হারাম হওয়া দরকার। এছাড়া এটা কোত্থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওসমান কেবল হারাম বস্তুই বর্জন করতেন?

সপ্তম দলীল– হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেছেন ঃ সঙ্গীত অন্তরে নেফাক তথা কপটতার জন্ম দেয়; যেমন পানি শাকসব্জি উৎপন্ন করে। কেউ কেউ এ উক্তিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বলেও বর্ণনা করেছেন। অথচ এটা সহীহ্ নয়। আরও বলা হয়, কিছু লোক হযরত ইবনে ওমরের সম্মুখ দিয়ে এহরাম বাঁধা অবস্থায় গমন করল। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি গান গাচ্ছিল। তিনি দু'বার বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের দোয়া কবুল না করুন। নাফে' বর্ণনা করেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমরের সঙ্গে পথিমধ্যে ছিলাম। তিনি এক রাখালের বাঁশীর আওয়াজ শুনে কানে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে

দিলেন এবং এ পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরলেন। তিনি কেবল আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন– তুমি বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ কি না? অবশেষে যখন আমি বললাম ঃ না, আর শুনা যায় না, তখন তিনি কান থেকে অঙ্গুলি বের করে নিলেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এরূপই করতে দেখেছি। ফোযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সঙ্গীত অপকর্মের দূত। ইয়াযিদে ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন ঃ সঙ্গীত থেকে দূরে থাক। কারণ, এটা কামভাব বৃদ্ধি করে, মনুষ্যত্ব ধূলিসাৎ করে, মদের বিকল্প এবং নেশার মত প্রভাব বিস্তার করে। যদি তুমি শুনই, তবে নারীদের সঙ্গীত শুনো না। কেননা, এটা ব্যভিচার দাবী করে।

এখন এ সমস্ত উক্তির জওয়াব লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেছেন– সঙ্গীত কপটতা সৃষ্টি করে- এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গায়কের মধ্যে এই প্রভাব ফেলে। কেননা, তার লক্ষ্যই থাকে নিজেকে অন্যদের সামনে পেশ করা এবং আপন কণ্ঠস্বর তাদেরকে শুনানো। এটা কপটতা, কিন্তু এ থেকে সঙ্গীত হারাম বলে প্রমাণিত হয় না। কেননা, উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করলেও অন্তরে কপটতা ও রিয়া সৃষ্টি হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করা হারাম নয়। হযরত ইবনে ওমরের উক্তি– আল্লাহ্ তোমাদের দোয়া কবুল না করুন– এ থেকেও সঙ্গীত হারাম বলে প্রমাণিত হয় না। বরং তারা এহ্রাম বাঁধা অবস্থায় ছিল বিধায় নারীদের আলোচনা তাদের জন্যে সমীচীন ছিল না। তাদের ভাবসাব দেখে তিনি বুঝে নেন যে, তাদের সঙ্গীত বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের আগ্রহ-প্রসূত নয়; বরং নিছক ক্রীড়া-কৌতুকচ্ছলে। তাই তিনি এটা অপছন্দ করলেন। তাঁর কানে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দেয়া দ্বারাও হারাম হওয়া প্রণাণিত হয় না। কেননা, এতে আছে, তিনি নাফে'কে কানে অঙ্গুলি ঢুকাতে বলেননি এবং শুনতে নিষেধ করেননি। তবে তাঁর নিজের এ কাজ করার কারণ হচ্ছে, তিনি নিজের মনকে এই আওয়াজ শুনা থেকে পবিত্র রেখেছেন, যাতে যে ধ্যানে তিনি ছিলেন, তা ব্যাহত অথবা যিকির বাধাপ্রাপ্ত না হয়। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ও এ কারণেই তা করেছিলেন। তিনিও হযরত ইবনে ওমরকে বাঁশীর আওয়াজ শুনতে নিষেধ করেননি। সুতরাং বুঝা যায়, হারাম হওয়ার কারণে তিনি এরূপ করেননি; বরং এটা উত্তম ছিল। আমাদের মতে অধিকাংশ অবস্থায় এটা বর্জন করা উত্তম; বরং দুনিয়ার অধিকাংশ বৈধ বস্তু বর্জন করা ভাল, যদি অন্তরে তার প্রভাব পড়ার ধারণা প্রবল হয়। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামাযান্তে আবু জাহমের প্রেরিত পোশাক খুলে

ফেলেছিলেন। কারণ, তাতে চিত্র অংকিত ছিল। ফলে তাঁর অন্তর তাতে মশগুল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এতে কি প্রমাণিত হয় যে, কাপড়ে চিত্র অংকন করা হারাম? ফোযায়লের উক্তি– সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র এবং এর কাছাকাছি অন্যান্য উক্তির জওয়াব হচ্ছে, এটা পাপাচারী, যুবক ও কামপ্রবণ ব্যক্তিদের সঙ্গীতের অবস্থা। সকল সঙ্গীতের এ অবস্থা হলে রসূলে করীম (সাঃ)-এর গৃহে দু'বালিকার সঙ্গীত শ্রবণ করা হত না।

এটা অনস্বীকার্য যে, সঙ্গীত খেলাধুলার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু দুনিয়া সবটুকুই খেলাধুলা। সেমতে হযরত ওমর (রাঃ) আপন পত্নীকে বলেছিলেন ঃ তুমি গৃহের কোণে একটি খেলনা মাত্র। অনুরূপভাবে রং তামাশা অশ্লীল না হলে বৈধ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এটা করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এছাড়া আমরা বলি, খেলাধুলা মনকে স্বস্তি দান করে এবং চিন্তার বোঝা লাঘব করে। উদাহরণতঃ যারা লেখাপড়া করে, তাদের জুমার দিন ছুটি ভোগ করা উচিত। কেননা, একদিনের ছুটি অন্যান্য দিনের কাজে স্ফূর্তি আনয়নে সহায়ক হয়। মোট কথা, ছুটি কাজে সহায়তা করে এবং খেলাধুলা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সাহায্য করে। খেলাধুলা মানসিক ক্লান্তির প্রতিকার বিধায় এটা বৈধ হওয়া উচিত। কিন্তু এর আধিক্য না হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেমন ওষুধ অধিক মাত্রায় সেবন না করা বাঞ্ছনীয়। এ নিয়তে খেলাধুলা করলে তাতে সওয়াবও হবে। আনন্দ ও স্বস্তি ছাড়া সঙ্গীত যার মধ্যে অন্য কোন কুপ্রভাব ফেলে না, তার জন্যে সঙ্গীত মোস্তাহাব হওয়া উচিত, যাতে এর মাধ্যমে সে মনযিলে মকসুদে পৌঁছতে পারে। হাঁ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এটা কামেলের মর্তবার নীচে। কামেল সে ব্যক্তিই, যে নিজের মনকে স্বস্তি দেয়ার ব্যাপারে সত্য বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। কথায় বলে– সৎকর্মপরায়ণদের পুণ্য কাজ নৈকট্যশীলদের জন্যে উপকারী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেমার প্রভাব ও আদব

উল্লেখ্য, সেমার প্রথম স্তর হচ্ছে শ্রুত বিষয় হৃদয়ঙ্গম হওয়া, দ্বিতীয় স্তর হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পর ওজ্দ হওয়া এবং তৃতীয় স্তর ওজদের কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আন্দোলন হওয়া। নিম্নে এ তিনটি স্তরই আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

সেমা হৃদয়ঙ্গম হওয়া ঃ এটা শ্রোতার অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। শ্রোতার অবস্থা চারটি ঃ প্রথম– স্বাভাবিকভাবে শ্রবণ করা; অর্থাৎ, সুর ও তালের আনন্দ ছাড়া সেমার অন্য কোন প্রভাব গ্রহণ না করা। এরূপ শ্রবণ বৈধ এবং সেমার স্তরসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর। কেননা, এ স্তরে উট এবং চতুষ্পদ জন্তুও শ্রোতার অংশীদার। বরং এ রুচির জন্যে কেবল প্রাণ থাকা দরকার। প্রত্যেক প্রাণী সুললিত স্বর দ্বারা এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে থাকে। দ্বিতীয়– অবস্থা বুঝে সুঝে শ্রবণ করা এবং বিষয়বস্তুকে কোন নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কল্পনা করতে থাকা। যুবক ও কামপ্রবণরা এরূপ শ্রবণ করে। এটা খারাপ ও নিষিদ্ধ– একথা বলাই যথেষ্ট। এর বেশী বলার প্রয়োজন নেই। তৃতীয় অবস্থা শ্রুত বিষয়কে নিজের অবস্থার মধ্যে কল্পনা করা। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে শ্রোতা যেসকল অবস্থার সম্মুখীন হয়– কখনও সমর্থ হয় এবং কখনও অক্ষমতা দেখা দেয়– এগুলো করে যাওয়া। মুরীদ বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরের মুরীদরা এভাবে শ্রবণ করে থাকে। সঙ্গীতের বিষয়বস্তু নিজের অবস্থার মধ্যে কল্পনা করার কয়েকটি নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

জনৈক সুফী এক ব্যক্তিকে কবিতা গাইতে শুনল যার মর্মার্থ নিম্নরূপ–

–দূত আমাকে বলল ঃ কাল তুমি সাক্ষাৎ করবে। আমি বললাম ঃ কি বলছ, কিছু খবরও রাখ?

উল্লিখিত মর্ম সম্বলিত কবিতা শুনে সূফী এতটুকু উত্তেজিত হল যে, বারবার পড়তে লাগল এবং "তুমি"র জায়গায় "আমি" বলতে লাগল। এর পর আনন্দের আতিশয্যে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আসার পর তাকে এই ওজদের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই এরশাদ আমার মনে পড়ে গিয়েছিল– জান্নাতীরা প্রতি সপ্তাহে একবার করে পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ লাভ করবে।

ইবনে দাররাজ বর্ণনা করেন– আমি ও ইবনে কৃতী বসরা ও আয়লার মধ্যস্থলে দজলার দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে একটি সুরম্য প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হল। প্রাসাদের বারান্দায় এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিল। তার সামনে এক বাঁদী কবিতা আবৃত্তি করছিল যার মর্ম নিম্নরূপ–

–প্রত্যহ তোমার অবস্থার মধ্যে নব নব পরিবর্তন হচ্ছে। এ ছাড়াও তো আরও কিছু করা তোমার জন্যে শোভনীয়।

ঘটনাক্রমে তখন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত জনৈক ফকীরবেশী যুবক বারান্দার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। কণ্ঠস্বর শুনে সে বাঁদীকে বলল ঃ তোমাকে আল্লাহ্র কসম এবং তোমার প্রভুর হায়াতের কসম, তুমি চরণটি পুনরায় আবৃত্তি কর। বাঁদী পুনরায় তা আবৃত্তি করলে যুবক বলল ঃ আল্লাহ্ তাআলার সাথে আমার অবস্থার পরিবর্তনও তাই। অতঃপর সে একটি মর্মভেদী চীৎকার করে প্রাণত্যাগ করল। ইবনে দাররাজ বলেন ঃ অতঃপর আমি আমার সঙ্গীকে বললাম– এখন তো আমরা একটি ফরয কাজের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি। এ লোকটির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। গৃহস্বামী বাঁদীকে বলল ঃ তুই আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুক্ত। এর পর বসরার লোকজন বেরিয়ে এল এবং যুবকের জানাযায় শরীক হল। দাফন শেষে গৃহস্বামী তাদেরকে বলল ঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি– এ প্রাসাদসহ আমার যত ধনসম্পদ আছে, সমস্তই ওয়াকফ করলাম। আমার সকল বাঁদী মুক্ত। অতঃপর সে তার পোশাক খুলে ফেলল এবং একটি লুঙ্গি পরিধান করে ও অপরটি কাঁধে ফেলে অজানার পথে রওয়ানা হয়ে গেল। লোকজন তার বিরহে কান্নাকাটি করছিল। সে কোথায় গেল, কি করল, পরে আর তা জানা গেল না। যুবকটি আল্লাহ্ তাআলার সাথে নিজের অবস্থায় সব সময় ডুবে থাকত এবং এ কাজে যথার্থ আদবের ব্যাপারে সে নিজেকে অক্ষম মনে করত। অন্তরের দৃঢ়তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার কারণে খুব দুঃখ করত। তার অবস্থার সাথে খাপ খায় এমন কবিতার আওয়াজ যখন তার কানে পড়ল, তখন সে কল্পনা করল– আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে বলা হচ্ছে, প্রত্যহ তুমি নতুন রং পরিবর্তন করছ। এরূপ না করাই তোমার জন্যে শ্রেয়।

চতুর্থ অবস্থা– শ্রোতার এমন হওয়া যে, সে সকল হাল ও মকাম অতিক্রম করে এখন আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছু বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। এমনকি, সে নিজেকে পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে সাক্ষাত খোদায়ী উপস্থিতির দরিয়ায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। তার অবস্থা সেই মহিলাদের অনুরূপ, যারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মুখশ্রী দেখার সময় আপন

আপন অঙ্গুলি কেটে ফেলেছিল এবং এমন অচেতন হয়ে পড়েছিল যে, অঙ্গুলি কর্তনের কোন খবরই তাদের ছিল না। এ ধরনের অবস্থাকে "ফানা ফিন্নফস" বলা হয়; অর্থাৎ, অহংকেও বিস্মৃত হয়ে যাওয়া। বলাবাহুল্য, যে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে যাবে, সে অন্য সব কিছুকে আরও বেশী বিস্মৃত হয়ে যাবে। সে যেন একমাত্র আল্লাহ্র সত্তা (যার কাছে সে উপস্থিত) ছাড়া অন্য সব বস্তু থেকে ফানা হয়ে যায়। এমনকি, মোশাহাদা (প্রত্যক্ষ করা) থেকেও ফানা হয়ে যায়। কেননা, অন্তর যদি মোশাহাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে এবং নিজের দিকে ধ্যান দেয় যে, সে মোশাহাদা করছে, তবে আল্লাহ্ থেকে গাফেল হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ যখন কেউ দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন বস্তু দেখার মধ্যে বেশী মাত্রায় নিমজ্জিত হয়, তখন দেখার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ থাকে না এবং যে চোখ দিয়ে দেখে, সেই চোখের প্রতিও খেয়াল থাকে না। যে অন্তর দ্বারা আনন্দ অনুভব করে, সেই অন্তরও কল্পনায় থাকে না। অনুরূপভাবে কোন বস্তুকে জানা এক বিষয় এবং সেই জানাকে জানা ভিন্ন বিষয়। যেব্যক্তি কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত, যখন তার ধ্যানে সেই জ্ঞাত হওয়ার জ্ঞান হবে, তখন সে সেই বস্তু সম্পর্কে গাফেল সাব্যস্ত হবে। ফানার এ অবস্থা অধিকাংশ সময় বিদ্যুতের চমকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়– দীর্ঘস্থায়ী হলে তা সহ্য করার শক্তি মানুষের নেই; বরং মাঝে মাঝে এই বোঝার নীচে মানুষ ছট্ফট্ করে মৃত্যুবরণ করে। সেমতে বর্ণিত আছে, আবুল হাসান নূরী (রঃ) এক সেমার মজলিসে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতা শুনতে পান ঃ–

–আমি সর্বদা তোমার মহব্বতে এমন মজলিসে পৌঁছি, যেখানে পৌঁছার সময় জ্ঞানবুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে যায়।

উদ্ধৃত বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতা শুনামাত্রই তার মধ্যে ওজদ্ দেখা দেয় এবং তিনি একদিকে রওয়ানা হয়ে যান। ঘটনাক্রমে তিনি এক জঙ্গলে পৌঁছলেন, সেখান থেকে সদ্য বাঁশ কেটে নেয়া হয়েছিল এবং বাঁশের শিকড়গুলো ধারালো অবস্থায় খাড়া ছিল। তিনি এগুলোর মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন এবং সকাল পর্যন্ত সেই কবিতা আওড়াতে থাকেন। তাঁর পদযুগল রক্তাপ্লুত হয়ে যাচ্ছিল। এর পর তিনি কয়েকদিন জীবিত থাকেন এবং পরম প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে চলে যান। এ ধরনের বোধশক্তি ও ওজ্দ সিদ্দীকগণের হয়ে থাকে। সেমার সকল স্তরের মধ্যে এটা সর্বোচ্চ স্তর।

সেমা ও ওজদ ঃ আত্মার সাথে সেমার মিল সম্পর্কে সুফী ও দার্শনিক বুযুর্গগণ বক্তব্য পেশ করে থাকেন। ওজদের স্বরূপ সম্পর্কে

তাঁদের পক্ষ থেকে অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথমে আমরা তাঁদের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করব। এর পর যে উক্তিটি সুচিন্তিত, তা বর্ণনা করব। সুফীকুল শিরোমণি হযরত যুন্নুন মিসরী (রঃ) বলেন ঃ সেমা সত্যের আগন্তুক। অন্তরকে সত্যের দিকে আন্দোলিত করার জন্যে এর আগমন হয়ে থাকে। অতএব যে সত্যান্বেষায় এটা শুনবে, সে "মুহাক্কিক" তথা সত্যান্বেষী। আর যে প্রবৃত্তির তাড়নায় শুনবে, সে "যিন্দীক" তথা অবিশ্বাসী। তাঁর মতে সেমার মধ্যে ওজদ হচ্ছে সত্যের প্রতি অন্তরের ঝোঁক। অর্থাৎ, যখন সেমার আগন্তুক আসবে, তখন সত্য মওজুদ পাবে। কারণ, তার নামই সত্যের আগন্তুক। আবুল হুমায়ুন দাররাজ সেমার মধ্যে ওজদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন– ওজদ সেই অবস্থাকে বলে, যা সেমার সময় পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ সেমা আমাকে সৌন্দর্যের মাঠে দৌড়িয়ে নিয়ে যায়, ওজদে ফেলে দেয় এবং অকৃত্রিমতার পানপাত্র পান করায়। আমি এর মাধ্যমে খোদায়ী সন্তুষ্টির স্তরসমূহ অর্জন করেছি এবং পবিত্রতার বাগিচায় ও পরিমণ্ডলে ভ্রমণ করেছি। শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ সেমার বাহ্যিক রূপ ফেতনা এবং আভ্যন্তরীণ রূপ সতর্কীকরণ। যেব্যক্তি ইশারা বুঝে, তার জন্যে সতর্কীকরণের অবস্থা শ্রবণ করা হালাল। আর যে বুঝে না, সে ফেতনা ও বিপদে পড়তে চায়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যারা মারেফতের অধিকারী, তাদের জন্যে সেমা আত্মার খোরাক। আমর ইবনে ওসমান মক্কী (রহঃ) বলেন ঃ ওজদ সত্যের দিকে মুকাশাফার নাম। আবু সায়ীদ ইবনে আরাবী বলেন ঃ ওজদ হচ্ছে যবনিকা দূর হওয়া, বন্ধুকে প্রত্যক্ষ করা, বিবেক মওজুদ হওয়া, অদৃশ্যকে দেখা, অন্তরের সাথে কথা বলা এবং অহংকার দূর করতে অভ্যস্ত হওয়া। তিনি আরও বলেন ঃ ওজদ বিশেষত্বের প্রথম স্তর এবং অদৃশ্য বিষয়সমূহ সত্যায়ন করার কারণ। সাধক যখন ওজদের স্বাদ আস্বাদন করে এবং তার অন্তরে এর নূর চমকে, তখন তার মনে কোন সন্দেহ সংশয় অবশিষ্ট থাকে না। এক্ষণে আমরা ওজ্দ কাকে বলা উচিত, সে সম্পর্কে যা সত্য তাই লিপিবদ্ধ করছি। প্রকাশ থাকে যে, সেমার ফলস্বরূপ যে অবস্থা প্রকাশ পায়, তার নাম ওজদ। অর্থাৎ, শ্রোতা সঙ্গীত শ্রবণ করার পর নিজের মধ্যে একটি নতুন অবস্থা পায়। এ অবস্থার পরিণতি মুশাহাদা ও মুকাশাফা হবে অথবা আগ্রহ, ভয়, চিন্তা, দুঃখ, অস্থিরতা, আনন্দ, পরিতাপ, বিমোচন, সংকোচন ইত্যাদি হবে। সেমা এমন হালকে প্রস্ফুটিত করে অথবা শক্তিশালী করে। সুতরাং সেমা যদি এমন দুর্বল হয় যে, শ্রোতার বাহ্যিক দেহ আন্দোলিত করে না, তবে এরূপ অবস্থাকে ওজদ বলা হবে না। বাহ্যিক দেহে অবস্থার

পরিবর্তন জানা গেলেই কেবল তাকে ওজদ বলা হবে। এটা দুর্বল ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। যার ওজদ হয়, সে হাত পা যে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তার বাহ্যিক অবস্থা সেই পরিমাণে পরিবর্তন থেকে মুক্ত থাকে। ফলে প্রায়ই এমন হয় যে, ওজদ অন্তরে শক্তিশালী থাকে, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থায় পরিবর্তন আসে না। এক্ষেত্রে যার ওজদ হয়, সে শক্তিশালী হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ওজদ দুর্বল হওয়ার কারণে বাইরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

এখানে প্রশ্ন হয়, আল্লাহর কালাম কোরআন মজীদ শ্রবণ করে সুফীগণের ওজদ হয় না এবং কবিদের কালাম সঙ্গীত শ্রবণ করে ওজদ হয়ে যায়। যদি ওজদ আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও দানই হত, সত্য হত এবং শয়তানের প্রবঞ্চনা ও বাতিল না হত, তবে সঙ্গীতের তুলনায় কোরআন দ্বারা অধিকতর ওজদ হওয়া উচিত ছিল। এর জওয়াব হচ্ছে, যে ওজদ সত্য, তা আল্লাহ তাআলার মহব্বতের আতিশয্য এবং তাঁর দীদারের আগ্রহ থেকে উৎপন্ন হয়। এ ধরনের ওজদ কোরআন মজীদ শ্রবণ করলেও স্ফুটিত হয়। পক্ষান্তরে যে ওজদ সৃষ্ট বস্তুর মহব্বত ও এশক থেকে উৎপন্ন হয়, তা অবশ্য কোরআন মজীদ শুনলে স্ফুটিত হয় না। কোরআন মজীদ শুনল যে ওজদ হয়, তার সাক্ষী স্বয়ং কোরআন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ –শুনে রাখা, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

আরও বলা হয়েছে–

مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

–বার বার পঠিত কোরআন। এর কারণে তাদের লোমকূপ শিউরে উঠে, যারা পালনকর্তাকে ভয় করে। এর পর তাদের লোমকূপ ও অন্তর আল্লাহর যিকিরে নরম হয়।

অতএব প্রশান্তি, দেহের লোমকূপ শিউরে উঠা, ভয় এবং অন্তরের নম্রতা– এগুলো ওজদ ছাড়া কিছু নয়। কেননা. ওজদ তাকেই বলা হয়, যা শ্রবণ করার কারণে শ্রবণের পরে নিজের মধ্যে পাওয়া যায়। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

–মুমিন তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। আরও এরশাদ হয়েছে,–

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

যদি আমি এ কোরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনত ও বিদীর্ণ হতে দেখতে।

এসব আয়াতে বর্ণিত ভীতি ও বিনয় হচ্ছে ওজদ। তবে এগুলো হাল জাতীয় ওজদ– মুকাশাফা জাতীয় নয়। তবে এগুলো কোন সময় মুকাশাফা ও হুশিয়ারীর কারণ হয়ে যায়। কোরআন শ্রবণ করার সময় খোদাপ্রেমিকগণের ওজদ হয়েছে– এমন কাহিনী বিস্তর। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ সূরা হুদ আমাকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছে। এটাও ওজদেরই খবর। কেননা, বার্ধক্য বিমর্ষতা ও ভীতির ফল। বিমর্ষতা ও ভীতি ওজদের মধ্যে দাখিল। বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে সূরা নেসা তেলাওয়াত করলেন এবং এই আয়াতে পৌঁছলেন–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا ـ

–তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা হাযির করব এবং (হে রসূল!) আপনাকে হাযির করব তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতারূপে!

এ আয়াতে পৌঁছতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ব্যস ব্যস। সাথে সাথে তাঁর নয়নদ্বয় থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। এক রেওয়ায়েতে আছে– রসূলে করীম (সাঃ) নিজে পাঠ করলেন কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর সামনে এ আয়াত পাঠ করল–

اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا

–নিশ্চয় আমার কাছে বেড়ী, আগুনের স্তূপ, গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

সাথে সাথে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করেন–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস।

তিনি রহমতের আয়াত পাঠ করলে দোয়া করতেন এবং সুসংবাদ প্রার্থনা করতেন। বলাবাহুল্য, সুসংবাদ প্রার্থনা করা ওজদ। কোরআন শ্রবণে যাদের ওজদ হয়, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদের প্রশংসা করেছেন–

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۔

–তারা যখন শুনে রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তাদের চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করে সত্যকে জানার কারণে।

বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর বক্ষে উনানের উপর ডেগচির ন্যায় স্ফুটনের শব্দ শুনা যেত। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যেও অনেকে কোরআন শ্রবণ করে ওজদ করেছেন বলে বর্ণিত আছে। তাঁদের কেউ কেউ ছিটকে পড়েছেন, কেউ কেউ ক্রন্দন করেছেন এবং কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে তদবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। কথিত আছে, সুরারা ইবনে আবি আওফা রিকাকায় লোকজনকে নামায পড়াতেন। একবার এক রাকআতে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ –যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন হবে এক সংকটের দিন।

এটা পাঠ করতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং মেহরাবের মধ্যেই প্রাণত্যগ করলেন। তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ী। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলেন ঃ

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ

নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার আযাব সংঘটিত হবে। তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই।

আয়াতটি শুনে তিনি চীৎকার করে উঠলেন এবং বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এর পর তিনি দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। আবু জরীর তাবেয়ীর সামনে সালেহ মুররী কোরআনের কিছু অংশ পাঠ করলে তিনি চীৎকার করে মারা যান। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) জনৈক কারীকে পাঠ করতে শুনলেন–

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

এটা এমন দিন যে, তারা কথা বলতে পারবে না এবং তাদেরকে ওজর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না।

এতে তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। এমনিভাবে আরও অনেকের কাছ থেকে অনেক গল্প বর্ণিত আছে। সুফী বুযুর্গগণের অবস্থাও তাই বর্ণিত হয়েছে। শিবলী (রহঃ) রমযানের রাতে এক ইমামের পেছনে আপন মসজিদে নামায পড়তেন। ইমাম এই আয়াত পাঠ করল–

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

–আমি ইচ্ছা করলে আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করে নিতে পারি।

এটা শুনে হযরত শিবলী (রঃ) এমন জোরে চীৎকার করলেন যে, লোকেরা মনে করল তাঁর প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে চলে গেছে। তিনি ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন এবং তাঁর কাঁধ অবিরাম কাঁপতে লাগল। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রাঃ) হযরত সিররী সকতীর দরবারে গিয়ে দেখেন, সেখানে এক ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। হযরত সিররী বললেন ঃ লোকটি কোরআন পাকের এক আয়াত শুনে বেহুশ হয়ে গেছে। হযরত জুনায়দ বললেন ঃ তার কানের কাছে সেই আয়াত পুনরায় পাঠ করুন। আয়াতটি পুনরায় পাঠ করতেই লোকটির জ্ঞান ফিরে এল। হযরত সিররী জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ প্রতিকারটি তুমি কোথায় পেলে? জুনায়দ বললেন– হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর অন্ধত্ব সৃষ্ট জীবের কারণে (অর্থাৎ, পুত্র ইউসুফের বিরহে) ছিল। এর পর সৃষ্ট জীব দ্বারাই তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। যদি তাঁর অন্ধত্ব আল্লাহর কারণে হত, তা হলে সৃষ্ট জীব দ্বারা (অর্থাৎ, ইউসুফের মিলন দ্বারা) তিনি চক্ষুষ্মান হতে পারতেন না। হযরত সিররী এই জওয়াব শুনে খুবই প্রীত হলেন। জনৈক সুফী এক কারীকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলেন ঃ

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۔

হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

তিনি আয়াতটি পুনরায় পাঠ করিয়ে বললেন ঃ চিত্তকে কত ফিরে আসতে বলি, কিন্তু সে ফিরে আসে না। এর পর মত্ত অবস্থায় এমন চীৎকার দিলেন যে, প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন হয়, যদি কোরআন শ্রবণ ওজদ সৃষ্টি করতে পারে, তবে সুফীগণ কাওয়ালদের সঙ্গীত শ্রবণ করার জন্যে কেন একত্রিত হন? ক্বারীদের কাছে সমবেত হয়ে কোরআন শ্রবণ করেন কেন? সুতরাং কোন দাওয়াতে একত্রিত হওয়ার সময় কোন কারীকে ডেকে আনা উচিত–

কাওয়ালকে নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলার কালাম সঙ্গীতের চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। এর জওয়াব হচ্ছে, কোরআন শ্রবণ ওজদের কারণ বটে, কিন্তু এর তুলনায় ওজদের উদ্দীপনা সেমা দ্বারা বেশী হয় কয়েকটি কারণে। প্রথমত কোরআন পাকের সবগুলো আয়াত শ্রোতার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। উদাহরণতঃ যেব্যক্তির মধ্যে বিষাদ, আগ্রহ অথবা অনুতাপের অবস্থা প্রবল, নিম্নোক্ত আয়াত কিরূপে তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে? يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين। আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আদেশ করছেন যে, এক পুত্র দু'কন্যার সমান অংশ পাবে। এতে উত্তাধিকারের বিধান বর্ণিত হয়েছে। অপরপক্ষে কবিরা যেসকল কবিতা রচনা করে, সেগুলো মনের অবস্থাই ব্যক্ত করে। ফলে কবিতা দ্বারা মনের অবস্থা বুঝতে তেমন বেগ পেতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ কোরআনের আয়াতসমূহ অধিকাংশ লোকের স্মৃতিতে সংরক্ষিত এবং মনে প্রায়ই জাগরূক থাকে। আর যে কথা প্রথমবার শুনা হয়, তার প্রভাব অন্তরে বেশী হয়। দ্বিতীয়বার শুনলে প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তৃতীয়বারে তো প্রভাব থাকেই না বলা যায়। যার মধ্যে ওজদ প্রবল, তাকে যদি বলা হয়, সর্বদাই এক কবিতা আবৃত্তি করে দিনে একবার অথবা সপ্তাহে একবার ওজদ কর, তবে সে কিছুতেই পারবে না। তবে কবিতা বদলে দিলে অবশ্য তার মধ্যে নতুন ওজদ সৃষ্টি হবে, যদিও বিষয়বস্তু তাই থাকে এবং কেবল শব্দ বদলে দেয়া হয়। কারীর জন্যে সর্বক্ষণ নতুন কোরআন পাঠ করা সম্ভবপর নয়। কারণ, কোরআন সীমিত। এর শব্দও বদলানো যায় না। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) গ্রামীণ লোকদেরকে কোরআন পাঠ শুনে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেন, আমরাও এক সময় এরূপ ছিলাম, কিন্তু এখন আমাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেছে। এ থেকে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, হযরত আবু বকরের অন্তর গ্রামীণ লোকদের চেয়েও অধিক শক্ত ছিল অথবা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর কালামের প্রতি তাঁর ততটুকু মহব্বত ছিল না, যতটুকু গ্রামীণ লোকদের ছিল। বরং মূল কথা ছিল, অন্তরে বার বার আসার কারণে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন কাওয়াল অচেনা ও নতুন কবিতা সব সময় পড়তে পারে, কিন্তু কারী সব সময় নতুন আয়াত তেলাওয়াত করতে পারে না।

সেমার পঞ্চ আদব ও তার ভালমন্দ প্রভাব ঃ এ পর্যন্ত আমরা সেমা হৃদয়ঙ্গম করা ও ওজদ– এ দু'টি বিষয় বর্ণনা করেছি। এক্ষণে তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ, ওজদের বাহ্যিক প্রভাব তথা চীৎকার করা, ক্রন্দন করা ও

বস্ত্র ছিন্ন করা সম্পর্কে আলোচনা করছি। এ প্রসঙ্গে প্রথমে সেমার পাঁচটি আদব বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম আদব হচ্ছে, সেমার মধ্যে স্থান কাল ও সহচরবৃন্দের প্রতি দেখা উচিত। সেমতে হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ সেমার মধ্যে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় সেমা শ্রবণ করা উচিত নয়। তিনটি বিষয় হচ্ছে, সময় কাল, স্থান ও মজলিসের সহচরবৃন্দ। কালের প্রতি লক্ষ্য রাখার মানে হচ্ছে, খানা হাযির হওয়ার সময়, ঝগড়া বিবাদের সময়, নামাযের সময় অথবা অন্য কোন অন্তরায় থাকার সময় সেমা না হওয়া দরকার। এসব সময়ে সেমা হলে তাতে মন বসবে না। ফলে কোন উপকার হবে না। স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, চলন্ত পথে অথবা বিশ্রী গৃহে অথবা যে গৃহে ধ্যান আকর্ষণকারী কোন বস্তু থাকে, তাতে সেমা না হওয়া উচিত। সহচরবৃন্দের প্রতি খেয়াল রাখার অর্থ হচ্ছে, এমন কোন ব্যক্তি যেন মজলিসে না থাকে, যে সমমনা নয় অথবা যে সেমা অস্বীকার করে অথবা যে অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে মুক্ত। কেননা, এরূপ ব্যক্তির উপস্থিতি অস্বস্তিকর হবে এবং অন্তর তার দিকে মশগুল থাকবে। এ কারণেই যদি কোন অহংকারী দুনিয়াদার ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, যে লোক দেখানোর জন্যে নৃত্য করে ও বস্ত্র ছিন্ন করে, তবে এরূপ লোকও অন্তরের অস্বস্তির কারণ হয়। তাদের থেকেও দূরে থাকা জরুরী। মোট কথা, এসব শর্তের অনুপস্থিতিতে সেমা শ্রবণ না করাই উত্তম।

দ্বিতীয় আদব হচ্ছে, যদি মুরীদদের জন্য সেমা ক্ষতিকর হয়, তবে তাদের সামনে শায়খের সেমা শ্রবণ না করা উচিত। কাজেই শায়খ পূর্বাহ্নে মুরীদদের অবস্থা দেখে নেবেন। তিন প্রকার মুরীদের জন্যে সেমা ক্ষতিকর হয়ে থাকে। (১) যে মুরীদ আত্মিক পথে বাহ্যিক আমল ছাড়া অন্য কিছু আয়ত্ত করেনি এবং সেমার কোন স্বাদই পায়নি। এরূপ মুরীদের সেমায় মশগুল হওয়া নিষ্ফল। তার উচিত যিকির অথবা অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়া। সেমা তার জন্যে অযথা সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছু নয়। (২) যে মুরীদ সেমার রুচি রাখে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার মধ্যে জৈবিক বাসনা ও কামভাব বিদ্যমান আছে এবং এগুলোর বিপদাপদ থেকে মুক্ত নয়। কাজেই মাঝে মাঝে সেমা তার মধ্যে ক্রীড়া ও কামভাব জাগ্রত করে দিতে পারে এবং সাধনার পথে বাধা হয়ে যেতে পারে। (৩) যে মুরীদ কামভাব ও তার বিপদাপদ থেকে মুক্ত এবং অন্তরে খোদায়ী মহব্বতও প্রবল, কিন্তু সে বাহ্যিক এলেম পূর্ণরূপে অর্জন করেনি, আল্লাহর

নামসমূহ এবং সিফাত সম্পর্কেও সম্যক অবগত হয়নি, আল্লাহর জন্যে কি বৈধ এবং কি অবৈধ, তাও জানেনি, এরূপ ব্যক্তির সামনে সেমার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেলে সে যা কিছু শুনবে, তাই আল্লাহ তাআলার মধ্যে কল্পনা করবে– বৈধ হোক বা না হোক। এমতাবস্থায় সঙ্গীত দ্বারা যে উপকার হত, তার তুলনায় ক্ষতি বেশী হবে। কেননা, আল্লাহর শানে বৈধ নয় এরূপ বিষয় আল্লাহর মধ্যে কল্পনা করলে কাফের হয়ে যাবে। সহল তশতরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ওজদের পক্ষে কোরআন ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় না, তা বাতিল। মোট কথা, সেমা পদস্খলনের জায়গা। দুর্বলদেরকে এ থেকে আলাদা রাখা ওয়াজেব। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রঃ) বলেন ঃ আমি স্বপ্নে শয়তানকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুই আমাদের সহচরদেরকেও বশ করতে পারিস? সে বলল ঃ হাঁ, দু'সময়ে! সেমার সময় এবং দৃষ্টিপাত করার সময়। এই দু'সময়ে তাদের উপর আমার দখল হয়ে যায়। এই স্বপ্ন বর্ণনা করলে জনৈক বুযুর্গ বললেন ঃ আমি শয়তানকে দেখলে বলতাম ঃ তোর মত নির্বোধ কেউ নেই। যে শুনার সময় আল্লাহর কাছ থেকেই শুনে এবং দেখার সময় আল্লাহকেই দেখে, তার উপর জয়ী হবি কিরূপে? জুনায়দ বললেন ঃ আপনি ঠিক বলেছেন।

তৃতীয় আদব হচ্ছে, কাওয়াল যা কিছু বলে তা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এদিক-ওদিক ভ্রূক্ষেপ কম করবে। শ্রোতাদের দিকে তাকাবে না। তাদের উপর ওজদ প্রকাশ পেলে তা দেখবে না; বরং নিজের দিকে ধ্যান দেবে এবং মনের দেখাশুনা করবে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতে তোমাকে কি দেন, সেদিকে দেখবে। নড়াচড়া করবে না। এতে জলসার সহচরেরা পেরেশান হবে। এমনভাবে বসবে যেন দেহ নড়াচড়া না করে। খাকরানো ও হাই তোলা থেকে বিরত থাকবে। তালি বাজানো, নৃত্য করা ইত্যাদি সকল কৃত্রিম ও লোক দেখানো কাণ্ড পরিহার করবে। সেমার সময় অনাবশ্যক কথা বলবে না। ওজদ প্রবল হয়ে গেলে তা তিরস্কারযোগ্য নয়, কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করবে। লোক-নিন্দার ভয়ে পূর্বাবস্থায় কায়েম থাকবে না। জবরদস্তি ওজদ প্রকাশ করা অনুচিত। বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) একবার বনী ইসরাঈলের মধ্যে ওয়ায করলেন। এক ব্যক্তি ওয়ায শুনে পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসার প্রতি ওহী পাঠালেন– তাকে বলে দাও, সে যেন আমার জন্যে অন্তরকে খণ্ড-বিখণ্ড করে, বস্ত্রকে নয়। আবু আমর বললেন ঃ যে অবস্থা নিজের মধ্যে নেই, সঙ্গীত শুনে তা প্রকাশ করা ত্রিশ বছর গীবত করার চেয়েও খারাপ।

চতুর্থ আদব হচ্ছে, নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হলে দণ্ডায়মান হবে না এবং উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করবে না, কিন্তু যদি রিয়া ব্যতিরেকে নৃত্য করে এবং কান্নার আকৃতি ধারণ করে, তবে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, কান্নার আকৃতি ধারণ করলে ভয় সৃষ্টি হয় এবং নৃত্য আনন্দ ও স্ফূর্তির কারণ হয়। মোবাহ আনন্দকে আন্দোলিত করা জায়েয। নৃত্য অবৈধ হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হাবশীদের নৃত্য পরিদর্শন করতেন না। আনন্দের আতিশয্যে কোন কোন সাহাবীও নৃত্য করেছেন বলে বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত আমীর হামযার শিশু কন্যার প্রতিপালন কে করবে– এ নিয়ে যখন হযরত আলী মুর্তযা, তাঁর ভ্রাতা জাফর এবং যায়দ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর মধ্যে কলহ দেখা দেয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন ঃ তুমি আমার এবং আমি তোমার। একথা শুনে হযরত আলী (রাঃ) আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জাফরকে বললেন, তুমি আমার আকৃতি ও চরিত্রের অনুরূপ হয়েছ। একথা শুনে তিনি হযরত আলীর চেয়েও অধিক নৃত্য করলেন। তিনি হযরত যায়দকে বললেন ঃ তুমি আমার ভাই ও মওলা। একথা শুনে তিনি নৃত্যে হযরত জাফরকেও হার মানিয়ে দিলেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই শিশুকন্যা জাফরের কাছে লালিত-পালিত হবে। কেননা, তার খালা জাফরের স্ত্রী। খালা মায়ের সমান। মোট কথা, মানুষ আনন্দের আতিশয্যে নৃত্য করে। সুতরাং আনন্দ বৈধ হলে এবং নাচের মাধ্যমে উন্নত ও জোরদার হলে নাচ প্রশংসনীয় ও বৈধ হবে। পক্ষান্তরে আনন্দ অবৈধ হলে নৃত্যও অবৈধ হবে। এতদসত্ত্বেও নাচানাচি বুযুর্গ ও অনুসৃত ব্যক্তিবর্গের জন্যে সমীচীন নয়। কেননা, এটা অধিকাংশ ক্রীড়া-কৌতুকের ছলে হয়ে থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে যে বিষয় ক্রীড়া-কৌতুকের শামিল, তা থেকে অনুসৃত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বেঁচে থাকা উচিত, যাতে তারা সাধারণ দৃষ্টিতে হেয় না হয়ে যায় এবং মানুষ তাদের অনুসরণ বর্জন না করে। ওজদের মধ্যে পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করার অনুমতি নেই, কিন্তু যদি ওজদ এতদূর প্রবল হয় যে, মানুষ তার এখতিয়ার হারিয়ে ফেলে, তবে ভিন্ন কথা। তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত হবে, যার দ্বারা জবরদস্তি কোন কাজ করানো হয়।

পঞ্চম আদব হচ্ছে, যদি জলসার কোন ব্যক্তি সত্যিকার ওজদের কারণে দাঁড়িয়ে যায় অথবা ওজদ প্রকাশ করা ব্যতিরকে স্বেচ্ছায় দাঁড়িয়ে যায় এবং তার খাতিরে সকলেই দণ্ডায়মান হয়, তবে তুমিও দণ্ডায়মান হবে। কেননা, জলসার শরীকদের সাথে মিল রাখা সংসর্গের অন্যতম

শিষ্টাচার। এক্ষেত্রে "যেমন দেশ তেমন বেশ" হওয়া উচিত। কেননা, সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধাচরণ আতংকের কারণ হয়ে থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন- خالقوا الناس باخلاقهم অর্থাৎ, মানুষের সাথে তাদের অভ্যাস অনুযায়ী মেলামেশা কর। বিশেষত অভ্যাস যদি এমন হয়, যার সাথে মিল রাখলে সামাজিক শিষ্টাচার পালিত হয় এবং মানুষ খুশী হয়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে মিল রাখা জরুরী। সাহাবায়ে কেরামের আমলে এটা ছিল না বিধায় কেউ যদি একে বেদআত বলে, তবে এর জওয়াব হচ্ছে, যত মোবাহ কাজ রয়েছে, সবগুলো সাহাবায়ে কেরামের আমলে ছিল না। কাজেই প্রত্যেক বেদআত নিষিদ্ধ বেদআত নয়। বরং যে বেদআত কোন সুন্নতের বিরুদ্ধে যায়, তাই নিষিদ্ধ। আলোচ্য বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন আগন্তুকের জন্যে দাঁড়ানো আরবদের অভ্যাস ছিল না। এমনকি, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যেও কোন কোন অবস্থায় দাঁড়াতেন না। হযরত আনাসের রেওয়ায়েত থেকে এটা জানা যায়, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত নেই বিধায় যেসব এলাকায় আগন্তুকের সম্মানার্থে দাঁড়ানোর অভ্যাস আছে, সেখানে তা নিষিদ্ধ হবে না। কেননা, সম্মান প্রদর্শন করা ও মন খুশী করাই এর উদ্দেশ্য।

নবম অধ্যায়

সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ

প্রকাশ থাকে যে, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ করতে মানা করা ধর্মের একটি প্রধান স্তম্ভ। এর জন্যেই আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। যদি এ কাজের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়, তবে নবুওয়ত নিরর্থক, ধর্মকর্ম অন্তর্হিত, শৈথিল্য ব্যাপক, পথভ্রষ্টতা চরম, মূর্খতা সর্বব্যাপী এবং ফেতনার বাজার গরম হয়ে যাবে। তবে যে বিষয়ের আশংকা ছিল, তা এখন বাস্তব রূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ, ধর্মের এই মূল স্তম্ভটি বর্তমানে সর্বত্র উপেক্ষিত। এর স্বরূপ ও চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। মানুষ জৈবিক বাসনা ও কাম-প্রবৃত্তিতে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় স্বাধীন হয়ে গেছে। ভূপৃষ্ঠে এমন সত্যিকার ঈমানদার এখন দুর্লভ, যে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না। এমতাবস্থায় যেব্যক্তি এই ত্রুটি দূর করতে এবং এই ছিদ্র বন্ধ করতে সচেষ্ট হবে, সে সকল মানুষের মধ্যে সুন্নত পুনরুজ্জীবিত করার কারণে সুখ্যাত হবে এবং এমন পুরস্কারে ভূষিত হবে, যার সমতুল্য কোন পুরস্কার নেই। আমরা এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু চারটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদেশ ও নিষেধের ফযীলত এবং বর্জনের নিন্দা

এ সম্পর্কে কোরআন পাকের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ـ

তোমাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় থাকা চাই, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। তারা সৎকাজ করার আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করবে, তারাই হবে সফলকাম।

এই আয়াতে প্রথম বিষয় হচ্ছে, এতে আদেশসূচক পদবাচ্য অর্থাৎ, وَلْتَكُنْ ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝা যায়, এ কাজটি ওয়াজিব। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, সাফল্যকে বিশেষভাবে এর সাথেই জড়িত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে- তারাই হবে সফলকাম। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা একটি ফরযে কেফায়া- ফরযে আইন

নয়। যদি মুসলিম জাতির কিছু লোকও এ কাজটি সম্পাদন করে, তবে অবশিষ্টরা ফরয থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, এরূপ বলা হয়নি যে, তোমরা সকলেই এ কাজে ব্রতী হও। বরং বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্য থেকে একটি সম্প্রদায়ের এ কাজ সম্পাদন করা উচিত। এ কারণেই এক বা এ কাধিক ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদন করলে অন্যরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে, কিন্তু বিশেষ সফলতা তাদেরই প্রাপ্য হবে, যারা এ কাজ করবে। পক্ষান্তরে যদি সমগ্র জাতি এ কাজ থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে, তবে শাস্তি সবাইকে ভোগ করতে হবে; বিশেষত যাদের এ কাজের ক্ষমতা আছ।

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرٰتِ وَأُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِينَ ـ

আহলে কিতাবের সকলেই সমান নয়। একদল সরল পথে রয়েছে। তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, সেজদা করে, আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে, সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং পুণ্য কাজে প্রতিযোগিতা করে ধাবিত হয়। তারাই সৎকর্মপরায়ণ।

এ আয়াতে কেবল আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসে বিশ্বাস করাকেই সৎকর্মপরায়ণতা আখ্যা দেয়া হয়নি; বরং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকেও এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ ـ

ঈমানদার নারী ও ঈমানদার পুরুষরা একে অপরের সাহায্যকারী। তারা সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং নামায কায়েম করে।

এ আয়াতে ঈমানদারের বিশেষণে বলা হয়েছে যে, তারা ভাল কাজের আদেশ করে। অতএব যারা এটা বর্জন করবে, তারা ঈমানদারদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে।

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ـ

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাঊদ ও ঈসা ইবনে মরিয়মের বাচনিক অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা ছিল পাপিষ্ঠ এবং সীমালংঘনকারী। তারা একে অপরকে মন্দ কাজ করতে নিষেধ করত না, যা তারা করত, তা খুবই মন্দ!

এ আয়াতে তাদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ কঠোর ভাষায় এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মন্দ কাজে নিষেধ বর্জন করেছিল।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

–তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করবে।

এ আয়াত থেকে আদেশ ও নিষেধের শ্রেষ্ঠত্ব জানা যায়। কেননা বলা হয়েছে, এ ধরনের লোক সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ـ

অতঃপর তারা যখন উপদেশ ভুলে গেল, তখন আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম, যারা অসৎ কাজ করতে নিষেধ করত এবং যালেমদেরকে শোচনীয় শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ, তারা পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

এতে মন্দ কাজে নিষেধকারীদের রক্ষা পাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

–যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে।

এ আয়াতে আদেশ নিষেধকে নামায ও যাকাতের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, এটা ওয়াজিব।

تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ـ

তোমরা সৎকাজে একে অপরের সাথে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না।

এখানে সহযোগিতার অর্থ হচ্ছে, সৎকাজে উৎসাহ যোগাবে, কল্যাণের পথ সুগম করবে এবং যতদূর সম্ভব অনিষ্ট ও সীমালঙ্ঘনের পথ রুদ্ধ করে দেবে।

لو لا ينهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ـ

পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরা তাদেরকে পাপাচারের কথা বলতে এবং হারাম খেতে নিষেধ করল না কেন? তাদের ক্রিয়াকর্ম খুবই মন্দ।

এতে বলা হয়েছে, নিষেধ বর্জন করার কারণে তারা গোনাহগার হয়েছে।

فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد في الارض ـ

তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এমন প্রভাবশালী লোক যদি না থাকত যারা পৃথিবীতে দুষ্কর্ম করতে নিষেধ করত।

এতে বলা হয়েছে, যারা দুষ্কর্ম করতে নিষেধ করত, তাদের ছাড়া আমি সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

يايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسهم اوالوالدين والاقربين ـ

মুমিনগণ, তোমরা ইনসাফের উপর কায়েম থাক এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে সাক্ষ্য দাও যদিও তা স্বীয় স্বার্থ, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।

অতএব পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যে এটাই হচ্ছে সৎকাজের আদেশ।

لاخير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ـ

তাদের অধিকাংশ কানাঘুষায় কল্যাণ নেই; কিন্তু যে দান-খয়রাতের, সৎকাজের এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের আদেশ করে যে এটা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত, তাকে আমি মহা পুরস্কার দান করব।

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ـ

–যদি মুমিনদের দু'দল পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর।

অবাধ্যতা করতে মানা করা এবং আনুগত্যে আনাই হচ্ছে সন্ধি স্থাপন। তারা এটা না মানলে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ الى امر الله ـ

যে দল অবাধ্য হয়, তোমরা সকলে মিলে তার বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত আল্লাহ্র আদেশের দিকে ফিরে না আসে।

এরই নাম অসৎ কাজে নিষেধ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার খোতবায় বললেন ঃ মুসলমানগণ, তোমরা কোরআন শরীফের একটি আয়াত পাঠ কর এবং তার বিপরীত তফসীর করে থাক। আয়াতটি এই–

يايها الذين امنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم ـ

–মুমিনগণ, তোমরা নিজের চিন্তা কর। তোমরা যদি হেদায়াত পাও, তবে কেউ পথভ্রষ্ট হলে তাতে তোমাদের কিছু আসে-যায় না।

তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

ما بين قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر ان ينكر عليهم فلم يفعل الا يوشك ان يعمهم بعذاب من عنده ـ

যে সম্প্রদায় গোনাহ্ করে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকে, যে তাদেরকে নিষেধ করতে সক্ষম, যদি সে নিষেধ না করে, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি আযাব প্রেরণ করবেন।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এ আয়াতের সময়কাল এখন নয়। কেননা, এখন উপদেশ মানা হয়। অদূর ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে,

যখন সংকাজের আদেশ করা হলে নির্যাতন ভোগ করতে হবে এবং তুমি কিছু বললে কেউ তা শুনবে না। তখন তোমাকে এই আয়াত অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং শুধু নিজের চিন্তা করতে হবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। নতুবা আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর দুষ্ট লোকদেরকে চাপিয়ে দেবেন। তখন তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি দোয়া করলেও তা কবুল হবে না। অর্থাৎ, ভাল লোকদেরকে কেউ ভয় করবে না। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন– লোকসকল, আল্লাহ তা'আলার আদেশ হচ্ছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ সে দিন আসার পূর্বে, যখন তোমরা দোয়া করলে তা কবুল হবে না। এক হাদীসে আছে– আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে প্রশ্ন করবেন, কিসে তোমাকে মন্দ কাজে নিষেধ করা থেকে বিরত রাখল? তখন যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে জওয়াব শিখিয়ে দেন, তবে সে আরজ করবে ঃ ইলাহী, আমি তোমার উপর ভরসা করেছিলাম এবং মানুষকে ভয় করেছিলাম। অন্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে– মানুষের সব কথাবার্তা ক্ষতিকর হয়ে থাকে- উপকারী হয় না; কিন্তু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ। এটা ক্ষতিকর হয় না। আরও বলা হয়েছে– আল্লাহ্ তা'আলা বিশিষ্ট লোকগণকে সাধারণ লোকদের গোনাহের কারণে শাস্তি দেন না, কিন্তু সাধারণ লোকেরা যদি কোন কুকর্ম করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও বিশিষ্ট লোকেরা বাধা না দেয়, তবে বিশিষ্ট লোকদের উপর আযাব নাযিল করা হয়।

আবু উমামা বাহেলীর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের স্ত্রীরা অবাধ্য হয়ে যাবে, যুবকরা কুকর্ম শুরু করবে এবং তোমরা জেহাদ পরিত্যাগ করবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এটা কি অবশ্যই হবে? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহর কব্জায় আমার প্রাণ, তার কসম, এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার হবে। প্রশ্ন করা হল ঃ এর চেয়ে গুরুতর ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি দশা হবে যখন তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে না এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবে না? প্রশ্ন করা হল ঃ এটা কি হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহর কসম, এর চেয়েও গুরুতর কাজ হবে। শ্রোতারা আরজ করল ঃ এর চেয়ে গুরুতর কাজ কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমরা ভাল কাজকে মন্দ এবং মন্দ কাজকে ভাল মনে করবে? তারা আরজ করল ঃ ইয়া

রসূলাল্লাহ্! এটাও হবে? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, এর চেয়েও কঠিন ব্যাপার হবে। প্রশ্ন হল, এর চেয়ে কঠিন ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমরা অসৎ কাজের আদেশ করবে এবং সৎকাজ করতে নিষেধ করবে? শ্রোতারা আরজ করল ঃ এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার হবে। আল্লাহ তা'আলা নিজের কসম খেয়ে বলেন ঃ আমি তাদের উপর এমন ফেতনা বসিয়ে দেব যে, বুদ্ধিমানরা বিপাকে পড়ে যাবে। ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– যেব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার কাছে দাঁড়িয়ো না। কেননা, যে সেখানে উপস্থিত থাকে এবং এই বিপদ প্রতিরোধে সচেষ্ট হয় না, তার উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। যাকে অন্যায়ভাবে প্রহার করা হয়, তার কাছেও দাঁড়িয়ো না। কেননা, যে তার কাছে থেকে যুলুম প্রতিরোধ করে না, তার উপরও লা'নত বর্ষিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ যেব্যক্তি কোন স্থানে উপস্থিত থাকে, সত্য বলা থেকে বিরত থাকা তার জন্যে অনুচিত। কেননা, মৃত্যু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হবে না এবং যে রিযিক তার তকদীরে আছে, তা থেকে সে বঞ্চিত হবে না। (এমতাবস্থায় সত্য কথা বলতে ভয় কিসের?) এ হাদীসটি এ কথা জ্ঞাপন করে যে, যালেম ও ফাসেকদের গৃহে যাওয়া দুরস্ত নয় এবং এমন স্থানেও যাওয়া জায়েয নয়, যেখানে মন্দ কাজ দেখতে হয় এবং তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে না। কেননা, হাদীসে উপস্থিত ব্যক্তির উপর লা'নত বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। এ কারণেই কোন কোন পূর্ববর্তী বুযুর্গ নির্জনবাস অবলম্বন করেছেন। কারণ, তাঁরা দেখেছেন, হাটে-বাজারে, ঈদের ময়দানে এবং জনসমাবেশে সর্বত্রই কুকর্ম সংঘটিত হয় এবং তাঁরা তা দূর করতে অক্ষম। এমতাবস্থায় মানুষের কাছ থেকে হিজরত অপরিহার্য। এ কারণেই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) বলেন ঃ পরিব্রাজকরা আপন ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, এর কারণ তাই, যা আমরা ভোগ করছি; অর্থাৎ, তারা দেখেছে, অনাচার প্রকট এবং সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন। উপদেশদাতার কথা কেউ মানে না এবং ফেতনা-ফাসাদে সবাই লিপ্ত। তারা আশংকা করেছে, কোথাও খোদায়ী আযাব তাদেরকে স্পর্শ করে না বসে। তাই তারা এমন লোকদের সাথে বসবাস করার চেয়ে হিংস্র প্রাণীর সাথে বসবাস এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করার চেয়ে